হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ সেন
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, বি-লিট্
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব আশুতোষ অধ্যাপক
ইম্পিরিয়াল রেকর্ড কীপার

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও অন্নদা প্রেস ৪৫ বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে প্রভাতচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা অনেক দিন আগের লেখা। অপরিণত বয়সের অপরিপক্ক রচনায় যে সমস্ত দোষ থাকে তাহার সকলই হয়ত এই প্রবন্ধ গুলিতে দেখা যাইবে। তাছারা পনর বিশ বৎসরের মধ্যে নূতন গবেষণার ফলে কোন কোন বিষয়ে নূতন আলোকপাত হইয়াছে, অথচ প্রবন্ধগুলি পুণর্মুদ্রণের সময় কোন রূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রাওবাহাদুর গোবিন্দ সখারাম সরদেসাই এখন আর বাজীরাও পেশবার পানাসক্তির কথা অবিশ্বাস করেন না। পরলোকগত ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ের Oxford Histary of India এখন ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই পাঠ্য তালিকায় স্থান পাইয়াছে। এ বিষয়ে আমার অনুমান ঠিক হইয়া থাকিলেও এখন তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষে কঠোর ভাষা হয়ত প্রয়োগ করিতাম না। অল্প বয়সে ভাষার সংযম থাকে না। এতদিন পরে এই অসংযমের সংশোধন করা সঙ্গতবোধ করি নাই এই জন্য যে আমার তিরস্কার পরলোকগত মনীষিকে স্পর্শ করিবে না কিন্তু যে অপরাধের দণ্ড তখন ভোগ করি নাই এখন হয়ত তাহার শাস্তি গ্রহণের সুযোগ পাইব।

প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ ভাবে, রাজবাড়ে, পারসনীশ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং মারাঠী ভাষার সহিত যাহারা অপরিচিত তাহারা হয়ত এই পুস্তকের মধ্য দিয়া মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক গবেষণার কিঞ্চিত আভাস পাইতে

পারেন। এতদিন পরে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও বহু পূর্ব্বে লিখিত ও সমসাময়িক মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ কয়টিকে গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিবার ইহাই এক মাত্র কৈফিয়ত। ভাল হউক মন্দ হউক নিজের লেখার প্রতি লেখক মাত্রেরই কতকটা মমতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকাশকগণের আগ্রহ না থাকিলে হয়ত সেই মমতার প্রেরণায় বহু কালের বিস্মৃত রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার কথা ক্ষণকালের জন্যও মনে হইত না।

প্রকাশকেরা থাকেন কলিকাতায়, লেখক বর্ত্তমানে দিল্লী প্রবাসী। সুতরাং প্রুফ সংশোধনের ত্রুটিতে এবং হস্তলিপির অস্পষ্টতায় অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। "ক্রোধী পরায়ণ" যে "ক্রোধ পরায়ণের"ই বিকৃতরূপ তাহা হয়ত কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু "কর্ণাটকের নিম্বলকর" যে "ফলটনের নিম্বলকর" (১০৪ পৃষ্ঠা) তাহা অনুমান করা স্বভাবতঃই কঠিন। ১১০ পৃষ্ঠাশ "মুসলমান ধর্ম্মস্থানের জন্য" "ধর্ম্মস্থাপনের জন্য" ছাপা হইয়াছে। এই সকল ভুল ত্রুটির জন্য পাঠক দিগের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। উপসংহার অংশ বিশেষ-ভাবে এই পুস্তকের জন্যই লেখা হইয়াছে পূর্ব্বে অন্যত্র কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

সহৃদয় পাঠক যদি এই পুস্তকের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করেন তাহা হইলে অনুগৃহীত হইব। ইতি—

নিউ দিল্লী।
১৭ই নবেম্বর ১৯৪১।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায়

সন্ত রামদাস

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীর অভাব নাই। তাহাদের অধিকাংশেরই মতে নলিনী-দলগত-জলম্ অতিতরলম্ তদ্বৎ জীবনম্ অতিশয়চপলম্। অতএব, এ মায়া-প্রপঞ্চময় সংসার জ্ঞানীজন বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু স্বামী রামদাস এই 'প্রপঞ্চই পরমার্থ' বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই-খানেই তাঁহার বিশেষত্ব। বাল্যকালে একদিন চিন্তামগ্ন বালককে জননী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এত ভাবিতেছ কি?" বালক উত্তর করিয়াছিলেন "বিশ্বের কথা।" বালকের বিশ্ব খুব বড় নহে। উত্তর জীবনে তিনি দিবারাত্রি নিজের দেশের কথাই ভাবিতেন। জাগ্রতে দেখিতেন—দেশে ধর্ম্ম নাই, অন্ন নাই, দেশবাসী অনাহারে মরিতেছে, তাহার উপর বিধর্ম্মী রাজার দুঃসহ অন্যায় অত্যাচার। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেন—তাঁহার মহারাষ্ট্রে, 'আনন্দ বনভুবনে,' আবার ধর্ম্মের দুন্দুভি নাদিত হইতেছে, দিগ্‌বিজয়ী শত্রুর শক্তি চূর্ণ হইয়াছে, পররাজ্যলোলুপ শত্রুর পতন হইয়াছে, স্নান-সন্ধ্যার নিমিত্ত জলের আর অভাব নাই।

রামদাসের পিতৃদত্ত নাম নারায়ণ। পিতার নাম সূর্য্যাজী পন্ত, মাতার নাম রাণু বাঈ। তিন বৎসরের বড় এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নাম গঙ্গাধর।

মহারাষ্ট্রের জাম্বগ্রামে, ১৫৩০ শকে, কীলক সম্বৎসরে, চৈত্রমাসে, রামনবমীর দিনে দ্বিপ্রহরের সময় এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। উভয় ভ্রাতারই অতি অল্পবয়সে উপনয়ন হইয়াছিল, কিন্তু পিতা সূর্য্যাজী যখন গঙ্গাধরকে শুভদিন দেখিয়া দীক্ষা দিবার আয়োজন করিলেন, সেদিন নারায়ণের চিত্তও বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতার নিকট কিন্তু তাঁহার আবেদন নিষ্ফল হইল। কারণ, তিনি তখন নিতান্ত অপরিণত-বুদ্ধি বালক। ক্ষোভে ও দুঃখে নারায়ণ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে উপস্থিত হইলেন এক নদীর তীরে, প্রবল প্লাবনে তাহার উভয় কুল ভাসিয়া গিয়াছে। বিপুল কল্লোলে বিরাট জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু নারায়ণ ভয় পাইলেন না। তিনি সেই প্রবল প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

তীন গাঁবে বাহত বাহত।
গেলে তো সূর্য্যোদয় হোত।
তঁব একে গ্রামাসমীপ।
ঐলথড়ী সানন্দেঁ।

ছয় ক্রোশ সন্তরণ করিতে করিতে সূর্য্যোদয় হইল; তখন এক গ্রামের সমীপে তিনি সানন্দে নদীর তীর দেখিলেন। এক ব্রাহ্মণ দয়া-পরবশ হইয়া বালককে বস্ত্র ও উপবীত দিলেন। নারায়ণ সেই গ্রাম হইতে নদীর তীরপথে আবার চলিতে লাগিলেন। আসিলেন গোদাবরীর পুণ্যতীরে পঞ্চ-বটী ক্ষেত্রে যেখানে শ্রীরামের দেউল আছে সেইখানে। এইখানে ধ্যান-ধারণায় তাঁহার বার বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রীরামের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি আবার দেশ পর্য্যটনে বাহির হইলেন, দেশের অবস্থা দেখিবার জন্য। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত দ্রব হইল।

তিনি দেশের তৎকালীন অবস্থায় যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বড় করুণ।

পদার্থ মাত্র তিতুকা গেলা।
নুস্তা দেশ চি উরলা।
য়েনেঁ করিতাঁ বহুতালা।
সঙ্কট ঝালে ॥
মাণসা খাবয়া ধান্য নাহী।
আঁথরুণ পাংথরুণ তেঁ হি নাহী
ঘরা করায়া সামগ্রী নাহী।
কায় করিতী ॥
কাহী চ পাহতাঁ-ধড় নাহী।
বিচার সুচেনা কাঁহী।
অথণ্ড চিন্তেচা প্রবাহীঁ।
পড়িলে লোক ॥
প্রাণীমাত্র জালে দুঃখী।
পাহতাঁ কোনহী নাহী সুখী।
কঠিন কাল ওরথী
ধরীনাত কোনী ॥

ধন সম্পদ সমস্তই গিয়াছে, কেবল দেশমাত্র পড়িয়া আছে, সুতরাং অনেকেরই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। মানুষের খাইবার ধান্য নাই। বিছানায় পাতিবার বা গায়ে দিবার কাপড় নাই, ঘর করিবার উপাদান নাই, লোকে কি করিবে? কোন কাজেই মঙ্গল দেখিতে পাই না, কোন

উপায় মনে আসে না, লোক অখণ্ড চিন্তা-প্রবাহে পড়িয়া গিয়াছে। প্রাণীমাত্রই দুঃখী, কাহাকেও সুখী দেখিতে পাই না। কঠিন কাল পড়িয়াছে দেখিয়া কেহই আর কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করে না।

এই দারুণ অভাব দেখিয়া রামদাসের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে—

কাহী মিলেনা মিলেনা মিলেনা খায়লা।
ঠাঁব নাহীরে নাহীরে নাহীরে জায়লা॥
খাইবার কিছু মিলেনা মিলেনা মিলেনা।
যাইবার ঠাঁই নাই নাই নাই রে॥

কিন্তু কেবল এই অন্নকষ্টে মহারাষ্ট্রের দুঃখ পর্য্যবসিত হয় নাই। দেশে রাজার শাসন নাই। অশান্তি উপদ্রব চতুর্দ্দিকে, নারীর সম্মানও নিরাপদ নহে। অনাহারে কেহ মরিতেছে, কেহ দেশত্যাগ করিতেছে, কত গ্রাম পরিত্যক্ত হইতেছে, সমস্ত শস্য ধান্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত ব্রাহ্মণীকে ভ্রষ্ট করা হইয়াছে, দেশান্তরে বিক্রয় করা হইয়াছে, কত সুন্দরী নানা কষ্ট পাইয়া মরিতেছে।

কিতী য়েক মৃত্যাসি তে যোগ্য জালে।
কিতী য়েক তে দেশ ত্যাগোনি গেলে॥
কিতী য়েক গ্রামোঁ চি তে বোস জালী।
পিকেঁ সর্বধান্যে চ নানা বুড়ালীঁ॥

* * * *

কিতী গুর্জিণী ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টবীল্যা।
কিতী শাঁমুখী জাহজীঁ ফাঁকবীল্যা॥

কিতী য়েক দেশান্তরী ত্যা বীকিল্যা।
কিতী সুন্দরী হাল হৌউনী মেল্যা॥

দেশে তখন সর্ব্বত্রই পশুবলের প্রাধান্য। দৈহিক শক্তির রাজত্ব বোধ হয় আর কখনও সেখানকার লোক এমন অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নাই। তাই রামদাস বড় দুঃখে লিখিয়াছেন—ন্যায়ে বুড়ালী বুড়ালী জাহালী সির্জোরী—ন্যায় ধ্বংস হইয়াছে, সকলে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

রামদাস সন্ন্যাসী, কিন্তু সংসারবিরাগী নহেন, সংসারের হিতে দেশের হিতে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; সুতরাং দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীই চিরদিন লোক শিক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেকালে যাঁহারা শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সংসারবিরাগী। শাস্ত্র হইতে তাঁহারা বৈরাগ্যের উপদেশগুলিই উপবাস-ক্ষিন্ন স্বদেশবাসীগণের জন্য বাছিয়া বাহির করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—এই যে জগৎ, ইহা মিথ্যা, সত্যের আভাসমাত্রও এখানে পাইবে না। স্ত্রী পুত্র কন্যাও মিথ্যা, তাহাদের মায়া-রজ্জুতে আবদ্ধ হইও না। তাহারা যদি চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া মরেও, তবু বিচলিত হইও না, চিত্তের শান্তি ক্ষুব্ধ হইতে দিওনা, শান্ত সমাহিত হইয়া কেবল ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর। অনাহারে ক্লিষ্ট পুত্র-কলত্রদের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবাইয়া দাও; মৃদঙ্গ করতাল না মিলে যদি, পাথরের তো অভাব নাই, পাথর বাজাইয়া নাম কীর্ত্তন কর। উপবাস? উপবাসে ভয় পাইও না, ইহকালে উপবাস কর, পরকালে ইন্দ্রপুরীতে যাইয়া পারিজাতের মালা পরিয়া পেট ভরিয়া অমৃত খাইবে।

এই শিক্ষায় লোকের মন স্বভাবতঃই কর্ম্মবিমুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু সাধুসন্ত-গণের অজস্র বেদান্ত মহিমা কীর্ত্তনেও সাধারণের চিত্ত জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইল না। রামদাস বুঝিলেন যাহারা এতদিন কেবল শুনিয়া আসিয়াছে সংসার অসার, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে প্রপঞ্চেই পরমার্থ মিলে। দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ মূর্খ ভগবানের মাহাত্ম্য কি করিয়া বুঝিবে? করতালের শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না, তাহার কাছে রান্না হয় না, আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতির মত তাহাতে সুস্বাদু ফল ফলে না। দেশের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিতে হইলে লোকের নিকট ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে। রামদাস এইজন্য একটি নবীন সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা জনসেবাতেই জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া কর্ম্মের ও জ্ঞানের মহিমা প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়াছিল। সমর্থ রামদাস স্বামী এই উদ্দেশ্যে একদল শিষ্যকে সুশিক্ষিত করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করিলেন। তিনি নিজে রহিলেন সজ্জনগড়ের চাফল মঠে। কল্যাণ স্বামীকে সীনা নদীর তীরে ডোমগাঁওয়ে মঠ বাঁধিয়া দিলেন। উদ্ধব স্বামীর উপর গোদাবরীর দুই তীরে দুইটি মঠের ভার ন্যস্ত হইল। এইরূপ দেবদাস, বালকরাম, ত্র্যম্বক গোসাঞি, গোবিন্দ, রামচন্দ্র প্রভৃতি শিষ্য মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে রামদাসী মঠের মোহন্ত হইয়া বসিলেন। নবীন সম্প্রদায়ের মঠে দেশ ছাইয়া গেল। এই সকল মঠবাসী শিষ্যদিগকে রামদাস স্বামী উপদেশ দিলেন—

শরীর পরোপকারীঁ লাবাবেঁ।
বহুতাঁচ্যা কার্য্যাস য়াঁবে।

উনে পড়ো নেদাবেঁ।
কোনী য়েকাঁচে॥
দুসর্‍্যাচেঁ দুঃখে দুঃখবাবেঁ।
পরসন্তোষেঁ সুখী হ্বাবেঁ
প্রণিমাত্রাস মেলউন ঘ্যাবেঁ।
বর্‍্যা শব্দেঁ॥
বহুতাঁচে অন্যায় ক্ষমাবে।
বহুতাঁচে কার্য্যভাগ করাবে।
আপল্যাপরীস হ্বাবে।
প্রারিখে জন॥
আলস্য আবর্‍্যা চ দবড়াবা।
যেত্ন উদংডচি করাবা।
শব্দমৎসর ন করাবা।
কোনী য়েকাচা॥
পেরিলেঁ তেঁ উগবতেঁ।
বোলন্যাসারিখেঁ উত্তর য়েতেঁ।
তরী মগ কর্কশ বোলাবেঁ তেঁ
কায় নিমিত্য?
স্বয়েঁ আপণ কষ্টাবেঁ।
বহুতাঁচে সোসীত জাবেঁ।
ঝিজোনি কীর্ত্তীস উরাবেঁ।
নানা প্রকারেঁ॥

শরীর পরোপকারে লাগাইবে। সকলের কার্য্য করিবে, কাহারও বিষয়ে যেন কম না হয়। অপরের দুঃখে দুঃখিত হইবে, অপরের সন্তোষে সুখী হইবে। মিষ্টবাক্যে প্রাণীমাত্রেরই একতা সম্পাদন করিবে। সকলের অন্যায় ক্ষমা করিবে, সকলের কার্য্য করিবে, অপরকে নিজের তুল্য মনে করিবে। আলস্য সম্পূর্ণরূপে দমন করিবে, প্রভূত পরিশ্রম করিবে, কাহাকেও ঈর্ষাযুক্ত বাক্য বলিবে না। যাহা রোপণ করা যায় তাহাই অঙ্কুরিত হয়, অতএব যেরূপ বলিবে সেইরূপ উত্তর পাইবে, তবে কি নিমিত্ত কর্কশ বাক্য বলিবে? নিজে কর্ম্ম করিবে, অপরের উপদ্রব সহ্য করিয়া যাইবে, শরীর ক্ষয় করিয়াও নানা প্রকারে কীর্ত্তি রাখিবে। এই ধর্ম্ম, লোক-সেবার ধর্ম্ম; এই উপদেশ সাধারণ শিষ্যদিগের প্রতি।

মঠধারী মোহন্ত শিষ্যগণকে স্বামী বলিতেছেন—চন্দন যে পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ জানা যায় নাই, চন্দন ও অন্যান্য বৃক্ষ একই শ্রেণীতে ছিল। যেজন কথার অনুরূপ কার্য্য করে নিজে করিয়া উপদেশ দেয়, লোক তাহার কথাই সত্য বলিয়া মানে। সমস্তই খুব বড় চাই, সুতরাং খুব কড়াকড়িও চাই, মঠ করিয়া অহঙ্কার করিওনা।

জম্ববরী চন্দন ঝিজেনা।
তম্ববরী সুগন্ধ করেনা॥
চন্দন আনি বৃক্ষ নানা।
সগট হোতী॥
বোলন্যাসারিখে চালণেঁ।
স্বয়েঁ করূন বোলণেঁ।

তয়াচী বচনেঁ প্রমাণেঁ।
মানিতী জন॥
সমুদায় পাহিজে মোঠা।
তরী তণাবা অসাবা বরকটা।
মঠ করূন তাঠা।
ধরূঁ নয়ে॥

যাহা কিছু করিবার, তাহাতে আলস্য করিবে না। আলস্য করিলে পরমার্থের অনেক হানি হয়। সন্তরণকারী নিমজ্জনোন্মুখকে রক্ষা করিবে, সামর্থ্য থাকিতে ডুবিতে দিবেনা, বিবেকী পুরুষ মূর্খকে জ্ঞানবান করিবে।

কাহী সমুদায় করণেঁ।
য়েবিশীঁ আলস্য ন করণেঁ।
আলস্য করিতা উদণ্ড উণেঁ।
দিসেল পরমার্থী॥
পোহণারে বুড়তে তারাবে।
সামর্থ্যে বুড়োঁ নেদাবে।
মূর্খ তে শাহাণে করাবে।
বিবেকী পুরুষেঁ॥

ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে রামদাস স্বামী তাঁহার শিষ্য-দিগের উপর যুগপৎ লোকশিক্ষা ও লোকসেবার ভার দিয়াছিলেন। এমন কঠিন ভার সহসা কাহারও উপর দেওয়া চলে না। সুতরাং রামদাস স্বামী সহসা কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। প্রথমে তাঁহার মোহন্ত শিষ্যেরা সন্ন্যাস ও দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু যুবককে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। তারপর উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাকে চাফলে রামদাস স্বামীর নিকট

পাঠাইয়া দিতেন। রামদাস বয়স্ক ব্যক্তিকে সাধারণতঃ সন্ন্যাস দিতেন না, কারণ তিনি প্রচার করিতেছিলেন—সংসারীর কর্ত্তব্য, কর্ম্মের মহিমা। উপযুক্ত তরুণেরা দেশসেবার মন্ত্র গ্রহণ করিতে আসিলে তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না।

বাঙ্গালীর ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়েরা মহিলাদিগকে অন্তঃপুরের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। মহারাষ্ট্রে বহু বীররমণী অসি হস্তে সমর-ভূমিতে আপনাদের শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাবিত্রী-বাঈ নামে একজন প্রভু-কায়স্থ মহিলা অকুতোভয়ে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মোগলবিজয়ী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার অহল্যা-বাঈর মত বহু প্রতিভাশালিনী মহিলা আপনাদের শাসন-দক্ষতার জন্য ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু রামদাস, ব্রাহ্মণ রামদাস, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পৃষ্ঠ-পোষক রামদাস দেশসেবার অধিকার হইতে রমণী-দিগকে বঞ্চিত রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অকা-বাঈ ও বেণা-বাঈর নাম মহারাষ্ট্রের সকলের নিকট পরিচিত। অকা-বাঈর উপর রামদাস চাফল মঠের রন্ধনের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বেণা-বাঈর উপর ছিল গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যার ভার। এই বেণা-বাঈ "সীতা স্বয়ম্বর" নামক একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আপা-বাঈ নামে আর একটি সুকণ্ঠ মহিলা কীর্ত্তন করিতেন, রামদাস স্বামীও কখনও কখনও তাঁহার কীর্ত্তন-সভায় উপস্থিত থাকিতেন। এইরূপ বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য জনের উপর যোগ্য ভার ন্যস্ত হইত, কিন্তু সকল শিষ্য বা সকল শিষ্যাকে রামদাস সকল কার্য্য করিবার অধিকার দেন নাই, কোন নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি দেখিতে পারিতেন না, মঠের শৃঙ্খলার এতটুকু হানি হইলেই তিনি অপরাধীকে গুরুতর শারীরিক

দণ্ড দিতেন। একবার তিনি তাঁহার এক মোহন্ত শিষ্যকে বেত মারিয়াছিলেন।

রামদাসের শিষ্য ছিলেন অনেক, ভক্ত সংখ্যা আরও অনেক, তাহাদের মধ্যে মুকুটধারী নরপতি ও লক্ষপতিও ছিল। কিন্তু তিনি গুরুগিরি ব্যবসাটা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। শিষ্যের নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা করিতেন না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

আমচী প্রতিজ্ঞা ঐসী।
কাঁহী ন মাগাবেঁ শিষ্যাসী॥

"আমার প্রতিজ্ঞা এই যে শিষ্যের নিকট কিছু চাহিব না"। প্রবাদ আছে যে ছত্রপতি শিবাজী একদিন দানপত্র লিখিয়া রামদাসকে তাঁহার সমস্ত রাজ্য দান করিয়াছিলেন, রামদাস শিবাজীর রাজ্য শিবাজীকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—মনে রাখিও আজ হইতে তোমার এ রাজ্য বৈরাগীর রাজ্য, তুমি রাজ্যের সেবক মাত্র। সেই হইতে বৈরাগীর উত্তরীয় মারাঠা সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা হইয়াছিল। সেই পতাকার পতন ইংরেজের কামানের গুলিতে হয় নাই, তাহার পতন হইয়াছে মারাঠা জাতি শিবাজী ও রামদাসের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়া।

দেশের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি এতগুলি মঠ স্থাপন করিলেন, তাঁহারই জীবিতকালে তাঁহার আনন্দবনভুবনে অত্যাচারের ধ্বজদণ্ড ধূলিলুণ্ঠিত হইতে দেখিলেন, কিন্তু তরুণ বয়সে তাঁহার হৃদয়ে যে ব্যথা বাজিয়াছিল তাহার নিবৃত্তি হইল না। তিনি বাহিরে মঠের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে কঠিন শাস্তি দিতেন, শিবাজীর দুর্ব্বৃত্ত পুত্র সাম্ভাজীকে কুশাসনের জন্য তীব্র ভৎর্সনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই কাঁদিত চারিদিকে অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ দুঃখ দেখিয়া। তাঁহার

চিত্তের বেদনা কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে।—মোহন্ত-গিরি সুখের নয়, ইহাতে অপার দুঃখ, লোকের অপার দুঃখ শুনিতে বুক-ফাটে। লোকেরা নানারূপ বিকারী, তাহারা অনেক অন্যায় করে, চক্ষু আর ইহা কত দেখিবে, কর্ণ কত শুনিবে। বলিলে দুঃখ বোধ করে, কিন্তু অন্যায় দূর হয় না, হিত কথা বলিলে হিত বোধ করে না, শুনিতে কষ্ট বোধ করে। মঙ্গলের নিমিত্ত সকলই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে কিছুই সুখ নাই।

মহন্তী সুখাচী নাহী।
য়েথে দুঃখ উদণ্ডহী।
উদণ্ড দুঃখ লোকাঁচে।
ঐকতাঁ উর ফাটতো॥
লোক হে বিকারী নানা।
ফার অন্যায় বর্ত্তী।
পাহাবে তেঁ কিতী ডোরা॥
ঐকাবে শ্রবণেঁ কিতী॥
বলিতা দুঃখ মানিতী।
অন্যায়ে ঘাত নেণতী॥
সাঙ্গতা হিত বাটে না।
ঐকতাঁ ত্রাস মানিতী॥
অখণ্ড সর্ব্ব সোসাবেঁ।
ভলেপণাচি কারণে॥
পরন্তু সুখ তো নাহী।
কাঁহী কাঁহীঁ ক্বচিত হী॥

যাহার চিত্ত লোকের নৈতিক অবনতি ও আর্থিক অভাব দেখিয়া এত কাঁদে, কি করিয়া বলিব তিনি সংসার-বিরাগী! রামদাসের বৈরাগ্য আত্মত্যাগে, সংসারের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না।

রামদাস দেশসেবার নিমিত্ত সাহিত্যসেবাও করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ছোট ছোট কবিতা, অভঙ্গ ও রামায়ণের সুন্দরা ও যুদ্ধকাণ্ড এবং দাসবোধ পাওয়া গিয়াছে। দাসবোধ রামদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি। শিখদের যেমন গ্রন্থসাহেব, রামদাসী সম্প্রদায়ের সেইরূপ দাসবোধ। বেদ ও পুরাণ অপেক্ষাও তাহারা এই গ্রন্থখানির অধিক সম্মান করে, কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার সন্ধান দাসবোধেই পায়। রামদাস লিখিতেন সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসীর জন্য। সুতরাং তাঁহার রচনায় পণ্ডিতী ভাষার বড় অভাব। পদগুলি সরল মধুর, কিন্তু সজীব। রামদাসের ব্যক্তিত্ব তাহার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত, পড়িলে মনে হয় যেন স্বামী রামদাস সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু এই রচনার সরলতাই দাসবোধের একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব নহে। এই দাসবোধের একাদশ দশকে স্বামী রামদাস সাধারণ ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশ-প্রেম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইখানে তিনি বলিয়াছেন হরিনাম-কীর্ত্তনের মত রাজনীতি-চর্চ্চাও প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত প্রাচীন বা আধুনিক আর কোন হিন্দু সন্ন্যাসী এমন কথা বলিয়াছেন কিনা জানিনা, এই গ্রন্থেই তিনি বৈরাগ্যে পরমার্থবাদের পরিবর্ত্তে অতি অভিনব প্রপঞ্চে পরমার্থবাদ প্রচার করিয়াছেন। রামদাস যাহা বলেন—স্পষ্ট করিয়া বলেন। তাঁহার ভাব কখনও ভাষার পেঁচে অস্পষ্ট হয় নাই, অর্থ অলঙ্কারের ভারে চাপা পড়িয়া যায় নাই। তাই

তাঁহার আনন্দ-বন-ভুবনের স্বপ্নে যেমন পররাষ্ট্রলোলুপ পাপীর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইরূপ দাসবোধেও স্বভাবতঃই বিধর্ম্মী দুর্জ্জনের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। এক কথায় বলা যায় দাসবোধ স্বদেশপ্রেমের বেদ।

দাসবোধের হিন্দী অনুবাদ আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ এখনও হয় নাই। ভারতবর্ষের অন্য প্রাদেশিক ভাষাগুলি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বড় সঙ্কীর্ণতা দেখা যায়। বাঙ্গলা ভাষার বাছা বাছা বই হিন্দীতে, মারাঠীতে, গুজরাটীতে অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল ভাষার ভাল ভাল বইগুলির বাঙ্গলা অনুবাদ নাই। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি একদিন আমাকে দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন ঐ সকল ভাষায় অনুবাদের যোগ্য বই থাকিলে বাঙ্গলায় অনুবাদ হইত। জানিনা, তিনি রামদাসের দাসবোধ, তুকারামের অভঙ্গ, নামদেবের অভঙ্গ ও আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে হরি নারায়ণ আপ্‌টের বইগুলি অনুবাদের যোগ্য মনে করেন কিনা; আমার কিন্তু মনে হয় বাঙ্গালীর মনের এই সঙ্কীর্ণতা তাহার অযোগ্যতার পরিচায়ক।

দাসবোধের প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের আলোচনা করা প্রয়োজন। রামদাসের ভক্তেরা মনে করেন যে সমর্থ স্বামীই (রামদাস) মহারাষ্ট্রজাতীয় জীবনের প্রথম উদ্বোধন করেন, শিবাজী তাঁহার হাতের যন্ত্রমাত্র ছিলেন। শিবাজীর সহিত রামদাসের কবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে রামদাসের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই শিবাজী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে অধ্যাপক ভাটে বলেন যে শিবাজীর উপর রামদাসের যতটুকু প্রভাব, তদপেক্ষা রামদাসের উপর শিবাজীর প্রভাব অনেক বেশী। তিনি বলেন যে দাসবোধ

দশম-দশকেই রামদাস শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সপ্তম দশকে রামদাস লিখিয়াছিলেন—

সরলা শব্দাচী খটপট।
আলা গ্রন্থাচা শেবট।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে 'শেবট' বা সমাপ্তির আর বেশী দেরী নাই। শ্রীযুক্ত বিনায়ক লক্ষ্মণ ভাবেও তাঁহার মহারাষ্ট্র-সারস্বতে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দাসবোধের প্রথম অংশে সাধারণ বেদান্তবাদ ব্যতীত আর কিছুই নাই। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ঐ অংশের যথার্থ সমাপ্তি একাদশ দশকের পূর্ব্বেই হইয়াছে। তারপর একাদশ দশকে হঠাৎ নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। অধ্যাপক ভাটে বলেন যে দাসবোধের প্রথম অংশ রচনার সময়ে রামদাস শিবাজীর সহিত পরিচিত ছিলেন না। শিবাজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই প্রথম অংশ সমাপ্ত হইয়াছিল, তারপর শিবাজীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া রামদাস দাসবোধের দ্বিতীয় অংশ রচনা করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত জুড়িয়া দেন। বাস্তবিক এই উভয় অংশের মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য নাই। অধ্যাপক ভাটে আরও বলেন যে চাফলের দানপত্র শিবাজীর শেষ বয়সে লেখা। শিবাজী রামদাসকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহাতে অল্পবয়সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই দানপত্র আরও অনেকদিন আগে লিখিত হইত। এই যুক্তি একেবারে অসার বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। কিছুদিন পূর্ব্বে পুনার ভারত-ইতিহাস-সংশোধক-মণ্ডল একখানি শিবকালীন কাগজ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিবাজী আর একজন ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর প্রায় সমসাময়িক জীবন চরিত সভাসদ-বখরে (এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে) রামদাসের নামের উল্লেখ একবারও দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিবাজী ও রামদাস উভয়েই দেশভক্ত। উভয়েরই জীবনের আদর্শ এক। সুতরাং পথ বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সাক্ষাৎ হওয়ার পর শিবাজী রামদাসকে খুব ভক্তি করিতেন, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, কারণ স্বামী সমর্থ শিবাজী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং মহারাষ্ট্রে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠায় শিবাজী রামদাসের হস্তের যন্ত্রমাত্র ছিলেন এমন কথা বলা চলেনা। শিবাজী ও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের মত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা শক্তিশালী ব্যক্তিগণ কাহারও হস্তের ক্রীড়নক মাত্র হইয়া থাকিতে পারেন কিনা তাহাতে খুবই সন্দেহ আছে। রামদাসকে বড় করিবার জন্য শিবাজীকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। স্বামী সমর্থ মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের জন্য এবং মারাঠী সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। অপর পক্ষে শিবাজীকে বড় করিবার জন্যও রামদাসকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা উভয়েই স্বাধীন ভাবে দেশমাতৃকার সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতই তাঁহাদিগকে জীবনের মধ্যপথে মিলিত করিয়াছিল। শিবাজীর ভক্তি ও রামদাসের স্নেহ তাঁহাদের জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে পরস্পরের সহায়তা করিয়াছে। এইটুকু বলিলেই বোধ হয় রামদাসের নিকট শিবাজীর ও শিবাজীর নিকট রামদাসের ঋণের সম্যক পরিচয় দেওয়া হইল।

শিবাজীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে স্বামী রামদাস দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন আমার শরীর নষ্ট হইল, কিন্তু

আমার প্রকৃত স্বরূপ দাসবোধ রহিল, আমার উপদেশ রহিল, তদনুসারে কাজ করিও, খেদ করিওনা।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, অসাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই আমরা অবতারত্ব আরোপ করি। রামদাসও এই দুর্গতি হইতে রক্ষা পান নাই। শিবাজীকে তাঁহার সমকালীন ব্যক্তিরা শিবের অবতার বলিয়া মনে করিত, আর ভক্ত-গণের মতে রামদাস ছিলেন মারুতির অবতার। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, মানুষের চরিত্রবল অপেক্ষা অন্য কোন শক্তি বলবত্তর হইতে পারে কিনা, মহত্তর হইতে পারে কিনা, সে তর্ক তুলিলে বোধ হয় ভক্তবৃন্দ নাস্তিক বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু এই অবতারবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। স্বামী রামদাস অবতার; সুতরাং তাঁহার আদর্শ অনুকরণের অতীত বলিয়া ধারণা করিয়া লোকে সে চেষ্টা হইতে একেবারে নিবৃত্ত ও পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শিষ্যপরম্পরা আজিও মহারাষ্ট্রে বর্ত্তমান। তাঁহারা রামদাসের পূজা করেন, দাসবোধ পাঠ করেন, নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, কিন্তু যে দেশসেবা রামদাসের জীবনের ব্রত ছিল তাহা বোধ হয় তাঁহারা আর এক অবতারের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী

রামদাস শিবাজীর গুরু, বন্ধু ও উপদেষ্টা, আর ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী পেশবা প্রথম বাজীরাওএর গুরু। শিবাজী 'হিন্দু পাদশাহী' বা হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, আর বাজীরাও সেই 'হিন্দু-পাদশাহীর' বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং রামদাসের সহিত ব্রহ্মেন্দ্রের তুলনা করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী বঙ্গদেশে তেমন সুপরিচিত নহেন। সংসার ত্যাগ করিয়াও সংসারীর হিত চিন্তা করেন, লোকালয়ে থাকিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন করেন, রাজনীতিকে পরিহার করা কর্ত্তব্য মনে করেন না, এমন সন্ন্যাসী এদেশে সকল যুগেই বিরল। রামদাস কিন্তু সংসারবিরাগী হইয়াও সংসারীর হিতচিন্তায়ই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ভগবৎ চিন্তার সহিত দেশের হিতকামনাও করিয়াছিলেন, আর ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতির চর্চ্চাও করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সহিত মহরাষ্ট্র-বাসীরা যাঁহার তুলনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মেন্দ্রের জীবন-কাহিনী আলোচনা বোধহয় অসঙ্গত হইবে না।

বেরারের অন্তর্গত দুধেবাড়ী গ্রামে মহাদেব ভট্ট নামক একজন ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম উমাবাঈ। এই মহাদেব ভট্টের ঔরসে উমাবাঈর গর্ভে ১৬৪৯ সালে এক বালকের জন্ম হয়। বালকের পিতৃদত্ত নাম বিষ্ণু। এই বিষ্ণুই উত্তরকালে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু বাল্যে পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম না করিতেই তিনি পিতা মাতা উভয়কেই হারাইলেন। তখন রাজুরী নামক স্থানে গিয়া তিনি গণপতির আরাধনায় নিযুক্ত

হইলেন। প্রতি বৎসর শ্রাবণের শুক্ল প্রতিপদ হইতে ভাদ্রের শুক্লা-চতুর্থী পর্য্যন্ত তিনি নির্জ্জনে সমাধিস্থ হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেন। ১৬৬২ সালে তিনি কাশীধামে গিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। বিষ্ণুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মেন্দ্র হিমালয় হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। দেশভ্রমণকালে রামদাসের অন্তর তাঁহার স্বদেশবাসীর দুঃখদারিদ্র্য দেখিয়া যেরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রহ্মেন্দ্রের চিত্তও সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। তীর্থপর্য্যটন শেষ হইলে তিনি চিপলুনের নিকট পেঢ়ে গ্রামের পরশুরামের মন্দিরে গেলেন এবং নিকটস্থ ধামণীর রম্য বনে তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন।

এইখানে বালগৌরী নামক এক গোপালক প্রথম তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করে। ব্রহ্মেন্দ্রের উৎকট সাধনা সরল রাখালের চিত্ত আকৃষ্ট করিল এবং শীঘ্রই মুখে মুখে তাঁহার তপোবলের অপূর্ব্ব কাহিনী চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ স্বামীর তপোবলের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

স্বামী তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'মহৎ পদারোহণের' আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ সফল হইতে বিলম্ব হয় নাই। সামান্য পল্লীসমিতির কর্ম্মচারী মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন। ইহার পর কীর্ত্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ছত্রপতি শাহু ও তাঁহার রাণী সগুণাবাই ও সকওয়ার বাই, পেশবা বালাজী বিশ্বনাথ ও তাঁহার পুত্র বাজীরাও, সুপ্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি আংগ্রিয়া, ইহারা সকলেই ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে আন্তরিক ভক্তি

করিতেন। ধনী ও উচ্চপদস্থ শিষ্য বৃদ্ধি করিতে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীও অনিচ্ছুক ছিলেন না। এইখানেই রামদাস ও সমকালীন অন্যান্য সাধুর সহিত ব্রহ্মেন্দ্রের প্রভেদ। রামদাস কখনও শিষ্যের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—শিষ্যের নিকট কিছু প্রার্থনা করা আমার রীতি নহে। শিবাজীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাম্রাজ্য তিনি তাঁহাকে হেলায় প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। সাধু তুকারামও শিবাজীর মত রাজার দরবারে যাইতে সম্মত হন নাই। তিনি শিবাজীকে লিখিয়াছিলেন।—

"যাব যে তোমার কাছে কি ফলিবে ফল ?
পথশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল।
সর্ব্ব অন্তর্যামী দেব তোমারে সদয়,
তাই লিখিতেছি হেন লিপি সবিনয়।
তা না হলে বিঠ্ঠলের সেবক যে জন,
কৃপার ভিখারী সেকি হয় কদাচন ?
রক্ষক পালক মোর প্রভু ভগবান্,
কে বা আছে এজগতে তাঁহার সমান।
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
শূন্য করিয়াছি ছিল যত অভিলাষ।
ত্যজিয়া বিষয়-সাধ সংসারের কাম,
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম।
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে,
তেমতি ব্যাকুলপ্রাণ বিঠ্ঠলের তরে।

* * * *

মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, ক্ষুধা হবে নাশ ;
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ত্যক্ত বাস।
পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন,
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আভরণ।
পর অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে,
আয়ুমাত্র ক্ষয় হয় ভোগ অভিলাষে।
সম্মান প্রয়াসী জন রাজগৃহে যায়,
কিন্তু, বল, শান্তি কভু মিলে কি তথায় ? *

আর পরবর্ত্তী কালে আর একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু সোহিরোবা নাথও এমনি ভাবে মহাদজী সিন্ধিয়াকে বলিয়াছিলেন—

অবধূত নেহি গরজতেরী হম্ বেপরোয়া ফকিরী ॥
তুম হ্যায় রাজা ময় হ্যায় জোগী পথর পথর ক্যাকুরী।
চার কোট জাহাগীর তুমারী। ওহী পন্থ হমারী ॥
সোনা চাঁদী হম নেহি চাহিয়ে অলখ ভুবনকে বাসী।
মহাল মুলুখ সব ঝাঁট বরাবর হম গুরুনাম উপাসী ॥
তুম ঢালীবন্দ হম ঝোলীবন্দ চার কোট জহাগীরী।
ত্রিকালমো দুয়ার ফিরতি ঘর ঘর অলখ ফুকারী।
তুম্ বী ডুবে হম বী ডুবায়ে তেরা হাম ক্যালিয়া।
কহে সোহিরা সুনো মহাদজী প্রকাশ জোগ গময়া ॥

এই বলিয়া সোহিরোবা নাথ চলিয়া যাইতেছিলেন। মহাদজী তাঁহাকে

* শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুবাদ।

আবার বসিতে অনুরোধ করিলেন। সোহিরোবা পুনরায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিলেন—

দৌলত থানা জিবানা মেরী। আপনা মৌজেন করলা ফেরী॥
কোই দিন চলযাকে দুকানে। কোই দিন পর্ব্বতপর ঠীকানে॥
তনকে করত কারভার। হামারে ছত্তিশ খিজমতগার॥
মন পবনকী পাগা। সোঁহে পীল খানেকী জাগা॥
করম কারখানা। হামারী নশীব জামাদার খানা॥
জব সোহিরা তখ্‌তপর বৈঠে। তব সব দুনিয়া লঁভপর বৈঠে॥

গৃহী তুকারাম ও সন্ন্যাসী সোহিরোবা নাথ যে নিস্পৃহতা দেখাইয়াছেন, সন্ন্যাসী ব্রহ্মেন্দ্র স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচার হইবার পর তাহা দেখাইতে পারেন নাই। শ্রাবণের শুক্ল প্রতিপদ হইতে ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত তিনি সমাধিস্থও তপশ্চর্য্যায় রত থাকিতেন, কিন্তু বৎসরের বাকী কয়েক মাস বাহির হইতেন ভিক্ষাটনে। তাঁহার শিষ্যেরা প্রায় সকলেই সম্পন্ন ব্যক্তি। মারাঠাসাম্রাজ্যের তখন উন্নতির দিন। তিনি রাজা, সেনাপতি ও অমাত্য-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন আর তাঁহাদের নিকট প্রণামী ও দক্ষিণা লইতেন। এই সন্ন্যাসীর মুষ্টি কিন্তু অল্পে পরিপূর্ণ হইত না। তাঁহার ভিক্ষার আয় ছিল বার্ষিক ১৬০০০৲ টাকারও উপরে। মূল্যের হিসাবে সেকালের ১৬০০০৲ একালের ৫০,০০০৲ এর চেয়ে বেশী বই কম হইবে না। তারপর ব্রহ্মেন্দ্রের শিষ্যেরা যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, তখন পরশুরামের নামে তাঁহাদের নিকট তিনি বিবিধ দ্রব্য চাহিয়া পাঠাইতেন। যেখানে যে জিনিষটি ভাল পাওয়া যায় গজদন্ত, কস্তুরী, মণিমুক্তা, বহুমূল্য শাটী, শাল, দোশালা হইতে ঘণ্টা, লবঙ্গ, তুলা, বাঁশ, চিনি, সকলই স্বামী তাঁহার দিগ্বিজয়ী শিষ্যগণের নিকট চাহিয়া লইতেন। এইভাবে

তাঁহার মঠের দ্রব্য সঞ্চয় বিপুল হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহার এই বিরাট ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে ইচ্ছামত উপহার দিতেন। ভিক্ষার নিমিত্ত তিনি সকলের নিকটই হাত পাতিতেন। ব্রাহ্মণ পেশবা ও ক্ষত্রিয় ছত্রপতি যেমন তাহাকে অর্থ ও গ্রাম দান করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তেমনি প্রতিবেশী মুসলমান নরপতিও তাঁহার পরশুরামের সেবার্থ দুইখানি গ্রাম ইনাম দিয়াছিলেন। তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যেমন নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহ হইত, তেমনি পরস্পরের ধর্ম্মস্থান দেবস্থানের প্রতিও উভয় ধর্ম্মাবলম্বী নরপতিদিগেরই সমান আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। শিবাজী মুসলমানের মসজিদ ও পীরস্থানের জন্য ইনামগাঁও দিয়া গিয়াছেন, আর জঞ্জিরার হাবশী রাজাও ব্রহ্মেন্দ্র-স্বামীকে পরশুরামের মন্দিরের জন্য গ্রাম দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

ভিক্ষালব্ধ টাকায় ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী মহাজনী ও অন্যবিধ ব্যবসা করিতেন। এই ব্যবসায়-সূত্রে প্রায় সকল মারাঠা সরদারের উপরই তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেকালে মারাঠা সরকারের ও সরদারদিগের টাকার বড়ই টানাটানি ছিল। শাহু সাতারার সিংহাসনে শক্ত হইয়া বসিবার আগে কোহ্লাপুর শাখার সহিত তাঁহার অনেক লড়াই করিতে হইয়াছিল। দেশে ঘরোয়া বিবাদ। বাহিরে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ। যুদ্ধের খরচ রাজসরকার হইতে পাওয়া যাইত না, কারণ ভাণ্ডার শূন্য। তাই রাজসেনাপতিগণ যুদ্ধের খরচ চালাইতেন, যুদ্ধলব্ধ আয়ের দ্বারা। কিন্তু অভিযানে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের টাকার দরকার হইত। এই টাকা তাঁহারা কাহারও নিকট উচ্চ সুদে ঋণ করিতেন, আর যুদ্ধান্তে পরিশোধ করিতেন। ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীই ছিলেন—তখনকার সর্ব্বাপেক্ষা বড় মহাজন। ভিক্ষার টাকা সুদে খাটাইয়া তাঁহার আয় নিতান্ত কম

হইত না। শ্রীযুত গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই বলেন যে, "কেবলমাত্র সুদ হইতেই ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর বার্ষিক ছয় হইতে দশ হাজার টাকা আয় হইত। এতদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক গ্রাম হইতে শ্রীভার্গবের নামে 'ভার্গবপট্টি' নামক কর আদায়ের কল্পনাও স্বামীর ছিল; কিন্তু এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

সুদ আদায়ের জন্য স্বামীজীর তম্বি তাগাদার ত্রুটি ছিল না। ব্রহ্মেন্দ্রের শিষ্য বাজীরাওয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা কোন কালেই ছিল না। ঋণের দায়ে তাঁহায় জীবনে শান্তি ছিল না। কিন্তু স্বামীর তাগাদার বিরাম নাই। তাই তিনি মনঃকষ্টে স্বামীর নিকট লিখিয়াছিলেন—এই জীবন মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইচ্ছা হয় লইতে পার। পত্র পাইলে এখানেই জীবন ত্যাগ করিব অথবা স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাণ দিব।

ভিক্ষায় এবং সুদে যাহা আয় হইত, ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী তাহা নিজের ভোগ সুখের জন্য ব্যয় করিতেন না। তাঁহার সমস্ত আয় ব্যয়িত হইত মন্দির নির্ম্মাণে, জলাশয় খননে এবং রাস্তা পথঘাটের সংস্কারে ও নির্ম্মাণে। শ্রীযুত সরদেশাই সত্যই বলিয়াছেন যে, স্বামী ছিলেন—সেকালের 'পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।"

ধামনীর রম্য কাননে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী চিরজীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। সিদ্দিসাত নামক একজন মুসলমান রাজ-পুরুষ সাবনুরের নবাবের নিকট হইতে একটী হাতী উপহার পাইয়াছিলেন। সেকালে জিনিষ-পত্র হস্তীঘোড়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন ঘাঁটিতে মাশুল দিতে হইত। স্বামীকে সে সময়কার সকল রাজপুরুষই খুব সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করিতেন; সুতরাং স্বামী এই হাতীটী সিদ্দিসাতের নিকট পৌঁছাইবার ভার লইলেন। সন্ন্যাসীর এইরূপ কাজে

লিপ্ত হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল না। কিন্তু তিনি সকলেরই খাতির রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এবারে কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। স্বামী কোহ্লাপুরের রাজার দস্তক লইয়া তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া বিনা শুল্কে হাতী লইয়া আংগ্রিয়ার এলাকায় প্রবেশ করিলেন। আংগ্রিয়া তাঁহার শিষ্য; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নে দস্তক সংগ্রহ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আংগ্রিয়ার কর্ম্মচারীগণ কিন্তু স্বামীর সম্মান রক্ষা না করিয়া হাতীটী আটক করিল। ইহা লইয়া সিদ্দি-সাতের সহিত আংগ্রিয়ার লোকদের একটা ছোটখাট লড়াই হইয়া গেল। সিদ্দি মনে করিলেন হাতী আটকের মূলে স্বামীর হাত আছে। তিনি স্বামীর আশ্রম ও পরশুরামের মন্দির লুণ্ঠন করিলেন। স্বামী তাঁহার হাতী তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন বটে; কিন্তু আংগ্রিয়া ও জঞ্জিরার হবসী নবাবের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও আর হাবশীর মুলুকে বাস করিলেন না। তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন সাতারা হইতে ছয় মাইল দূরে ধাওরণী নামক গ্রামে।

১৭৪৫ সালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণা-তীরে স্বামী তাঁহার চিরাচরিত সমাধির অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ নবম দিবসে সমাধি ভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিয়া তিনি দর্ভাসনের উপর মৃগাসন পাতিয়া বসিলেন। তারপর রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি সেইখানেই দেহ রক্ষা করিলেন। শাহুছত্রপতি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া স্বামীর নিকট আসিলেন। তারপর সকলে পাল্কীতে করিয়া স্বামীর দেহ ধাওরণীতে আনিয়া সমাধিস্থ করিলেন। শাহুনরপতি ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর সমাধির নিকট বহু অর্থব্যয়ে এক সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাউক, রামদাসের সহিত ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর তুলনা হইতে পারে কি না? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামদাসের নিস্পৃহতা ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীতে ছিল না। তিনি চাহিতেন লৌকিক সম্মান। সেইজন্য দরিদ্রের কথা তাঁহার চিঠি পত্রে বড় দেখা যায় না। রামদাস শিবাজীর দুর্ব্যসণী পুত্র সম্ভাজীকে যেরূপ কড়া ভাষায় চিঠি লিখিয়া চরিত্র সংশোধনের উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রহ্মেন্দ্র তাঁহার কোন পদস্থ শিষ্যকে সেরূপ উপদেশ দিতে পারেন নাই। তাই শিষ্য বাজীরাওকে তিনি মস্তানীর সহিত অবৈধ সংসর্গের জন্য কখনও ভৎ´সনা করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে শিষ্যের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁহাকে স্বীয় পত্রে 'চিরঞ্জীব রঘুপতি', 'রঘুনাথজী', 'রামসেবক হনুমন্ত', 'ভার্গবসেবক', 'একবচনী' 'সত্যবক্তা', 'গঙ্গাজল আচারে পুণ্যশীল ভক্তরাজ' প্রভৃতি গৌরবযুক্ত সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী সুলেখক ছিলেন। অসংখ্য পত্রে তাঁহার লিপি কুশলতার বহুল পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রামদাসের মত তাঁহার এই অনন্যসাধারণ লিপি কুশলতা সাধারণের শিক্ষায় প্রযুক্ত হয় নাই। তিনি চিঠি লিখিতেন রাজা মহারাজার নিকট। আর সে চিঠিতে থাকিত—বিবিধ প্রকার চাটুবাক্যের সহিত অর্থ যাচ্ঞা।

রামদাস ছিলেন—দুরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। তাই তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা দিতে, কর্ম্মের পথে নিয়োজিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মেন্দ্র এসকল বিষয় বুঝিতেন না। তিনি জানিতেন মন্দির নির্ম্মাণে পূণ্য আছে, তাহার জন্য অর্থ আবশ্যক। অর্থের জন্য বড়লোকের দরবার করিতে হইবে; সে বড়লোক হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক। তাঁহার চেষ্টায় মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের যে একটুও

বিস্তার হয় নাই, তাহা নহে। তাঁহারই প্ররোচনায় বাজীরাও জাঞ্জিরার হবশীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের মূল কারণ রাজনৈতিক নহে। একজন হবশী ব্রহ্মেন্দ্রের মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তিনি তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। তাই এই যুদ্ধ। নতুবা সমুদ্রের উপকূল জয় করিয়া প্রচণ্ড নৌশক্তি স্থাপনের কল্পনা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি শিবাজীর জাঞ্জিরা অভিযানের কথা নিশ্চয়ই জানিতেন, কারণ তিনি শিবাজীর সমকালীন ব্যক্তি। কিন্তু তথাপি শিবাজীর উদ্যোগের প্রকৃত মর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

রাজ্যশাসন ব্যাপারেও ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী হস্তক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাহাতে সু অপেক্ষা কুফল হইয়াছে বেশী। কারণ স্বামী রাজ্য অপেক্ষা শিষ্যের মঙ্গলকামনাই বেশী করিতেন। তাঁহার শিষ্য দোষী হইলেও তিনি তাহাকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। আবার তিনি যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইতেন, তাহাদিগকে অকারণ শাস্তি দিবার প্রযত্ন হইতেও বিরত থাকিতেন না। শিষ্যদিগকে অন্যের সম্পত্তি পাওয়াইয়া দিবার জন্য তিনি রাজদরবারে সুপারিস করিতে কসুর করেন নাই। এইজন্যই বাজীরাওএর তীক্ষ্ণধী পুত্র বালাজী বাজীরাও পিতৃগুরুর প্রতি তাদৃশ ভক্তি রাখিতে পারেন নাই।

মারাঠা সাম্রাজ্যে তখন দুইটি প্রবল দল। ব্রহ্মেন্দ্র চেষ্টা করিলে, তাঁহার মধ্যস্থতায় এই দুই দলের মনোমালিন্য দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা কখনও করেন নাই। তিনি করিয়াছিলেন—পেশবার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা। সুতরাং শাহুর দরবারে ব্রহ্মেন্দ্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলে পেশবার প্রাধান্য রক্ষিত হইলেও সমগ্র মারাঠা সাম্রাজ্যের মঙ্গল হয় নাই। এককথায় স্বদেশপ্রেমে, ত্যাগে, দূরদর্শিতায়

ব্রহ্মেন্দ্র রামদাসের সমকক্ষ ছিলেন না। বোধ হয়, রামদাসের সহিত এসকল বিষয়ে তাঁহার তুলনা করাই অসঙ্গত।

মহারাষ্ট্রে একদল যেমন ব্রহ্মেন্দ্রকে অযথা বাড়াইয়াছেন, আর একদল আবার তাঁহাকে তেমনই অযথা ছোট করিয়াছেন। ব্রহ্মেন্দ্র আদর্শ ব্যক্তি নহেন। সেকালের ও একালের অন্যান্য বহু সন্ন্যাসীর মত তিনিও একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। সাধারণ মানুষের মত তিনিও প্রিয় ব্যক্তির হিত ও অপ্রিয় ব্যক্তির অহিত কামনা করিতেন। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত ধর্ম্মাচরণ করিতেন। তাঁহার অর্থে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে সাধারণের উপকার হইয়াছে, আবার তাঁহার প্রভাবে রাজ্যের অমঙ্গলও হইয়াছে। কিন্তু সেইজন্য তাঁহাকে ভণ্ড, স্বার্থপর ও ক্রোধীপরায়ণ বলিয়া গালি দেওয়া উচিত হইবে না।

বাজীরাও ও মস্তানী

মস্তানী প্রথম বাজীরাওয়ের উপপত্নী। তাহার অপরূপ রূপলাবণ্যের আখ্যায়িকা আজিও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। কিন্তু কোথায় এই অসামান্যা রূপসীর জন্ম, কেমন করিয়া এই যবনী যুবতী ব্রাহ্মণ সেনাপতির অঙ্কে স্থান পাইয়াছিল তাহা এতদিন পরে জানিবার উপায় নাই। কেহ বলেন, বুন্দেলখণ্ডের অভিযানের সময় রাজা ছত্রসাল বাজীরাওকে এই নবীনা রূপসী উপহার দিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন। রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস এই প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মস্তানী রাজা ছত্রসালের কোন যবনী রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তান। বুন্দেলখণ্ড বিজয়ের পর বাজীরাওয়ের সহিত তাঁহার মিলন হয়। রাজা ছত্রসাল তাহাকে বিজয়ী ব্রাহ্মণ সেনাপতির মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উপঢৌকন দিয়াছিলেন, কিম্বা মনুষ্য সাধারণ উচ্চাভিলাষের বশীভূত হইয়া মুসলমানী মস্তানী স্বেচ্ছায় বাজীরাও এর অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। কিন্তু ইহা স্থির যে সঞ্চারিণী সুবর্ণলতার মত লাবণ্যবতী মস্তানীর রূপে বাজীরাওয়ের যে চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবিতকালে আর দূর হয় নাই। মস্তানীর জন্য বাজীরাও পুনার শনিবার-প্রাসাদে এক স্বতন্ত্র মহল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মহলের নাম "মস্তানী মহল" আর সেই দিকের দরজার নাম মস্তানী দরজা। দ্বিতীয় প্রবাদের মতে মস্তানী প্রথম ছিল নিজামের অন্তঃপুরে, মুসলমান সুবাদার ব্রাহ্মণ পেশবার উপযুক্ত উপহার বিবেচনায় তাহাকে বাজীরাওএর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মস্তানী

সম্বন্ধীয় আর একটী বিবরণ সোহনীকৃত পেশবা বখরে পাওয়া যায়। সুজায়েত খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে দিল্লীর বাদশাহ দক্ষিণের সুবাদার নিজাম-উল-মুলুকের শাস্তি বিধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সোহনীর মতে মস্তানী এই সুজায়েতের "কলাবন্তীন" বা নৃত্য-গীতাদি-কলা-কুশলা উপপত্নী। বাজীরাওএর ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা নিজামের পক্ষ গ্রহণ করিয়া সুজায়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সুজায়েতের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। শত্রুশিবির লুণ্ঠনের সময় মস্তানীর সহিত চিমণাজীর সাক্ষাৎ হয়, মস্তানী তখন বিষপানের আয়োজন করিতেছিল। মস্তানী অপরূপ রূপবতী, মারাঠা বখরকার লিখিয়াছেন, তাম্বুলপ্রাশন সময়ে তাহার স্বচ্ছ শ্বেত গ্রীবার উপর হইতেই তাম্বুলের লোহিত রসপ্রবাহ পরিলক্ষিত হইত। তাহার দেহে লক্ষ লক্ষ টাকার জহরত ছিল। সুজায়েত তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন, বড়ই যত্নে রাখিয়াছিলেন। চিমণাজী এই যবনী যুবতীর আত্মহত্যার আয়োজন দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মরিবে কেন? মস্তানী উত্তর করিল—আমার আর আশ্রয় নাই, তাই আমাকে মরিতে হইবে। তবে তুমি যদি আমাকে গ্রহণ কর, আমি মরিব না। চিমণাজী বলিলেন—তুমি মরিও না। আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের অভিলাষ হইলে তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন। আশ্বস্ত মস্তানী আত্মহত্যা করিল না। বাজীরাওএর সহিত সাক্ষাৎ হইলে মস্তানী দেখিল বাজীরাও তাঁহার কনিষ্ঠের মত সংযতচিত্ত বা নিষ্ঠাবান নহেন। এই সমরকুশল যুবক সেনানায়কের রণজয়ে যেমন স্পৃহা রমণীতেও সেইরূপ প্রবল লিপ্সা। বাজীরাও তখন বিবাহিত, সন্তানের জনক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজীর বয়স তখন নয় বৎসর। কিন্তু সন্তানস্নেহ বা দাম্পত্য কর্ত্তব্য তাঁহাকে পতনের

পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। যবনীর রূপজমোহে ব্রাহ্মণ সেনাপতি আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে মস্তানীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

অবৈধ প্রণয়ে জগতের ইতিহাসে বহু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ক্লিওপেট্রার কুহকে না ভুলিলে আণ্টনির ন্যায় মহাবীরের অমন শোচনীয় পরিণাম হইত না। ভীতিবিহ্বলা প্রণয়িণীর বিলাস তরণীর অনুসরণ করিয়া আণ্টনি যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করিলে রোমের ইতিহাস কোন্ পথে চলিত কে বলিতে পারে? ফরাসী বিপ্লবের জন্য মাদাম পম্পাডুর ও মাদাম ডুবারির দায়িত্বের পরিমাণ আজও স্থিরীকৃত হয় নাই। দিল্লীর এক হতভাগ্য বাদশাহ লাল কুয়ারের সুন্দর হাতের পিয়ালাভরা মদিরায় মত্ত না হইলে হয়ত তাহাকে সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের সহিত জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত না। বাজীরাওএর সৌভাগ্য, কাশীবাঈর মত তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণা পত্নী ছিল, চিমণাজীর মত স্নেহশীল কনিষ্ঠ ছিল, আর শাহুর মত• হিতাকাঙ্ক্ষী প্রভু ছিল। মস্তানীর রূপোন্মাদে বাজীরাও পত্নী ও পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ আপনার কাছে কাছে রাখিয়া বাজীরাও ও চিমণাজীকে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বালাজী বাজীরাও পিতার নিকট হইতে কোন শিক্ষা লাভ করেন নাই! তাঁহার যেটুকু শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা অর্জ্জিত হইয়াছে পিতৃব্যের শিবিরে। রাজনৈতিক বিপ্লব না হইলেও কাঞ্চনী কুহকগ্রস্ত বাজীরাওয়ের পারিবারিক শান্তি অব্যাহত থাকে নাই। কেমন করিয়া থাকিবে? তিনি দিবারাত্র থাকিতেন মস্তানীর মহলে। ভ্রমেও আপনার পরিণীতা পত্নীর নাম করিতেন না। বোধ হয় রাজ্য সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যেও আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ ছিল না। পুত্র

বালাজী বড় দুঃখে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—"নাসিরজঙ্গের বিগ্রহ মস্তানীর পায়ে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, রাজ-অনুগ্রহও আমরা হারাইয়াছি"। এই সময় হইতেই পিতা ও পুত্রে বৈমনস্য ঘটিয়াছিল।

ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান মহাপাপ। পেশবার সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণকে মদ্য বিক্রয় পর্য্যন্ত দণ্ডনীয় ছিল। কিন্তু যবনী মস্তানী ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে আসিয়াও বোধ হয় আপনার পান প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কথিত আছে যে সম্রাট ঔরংজীবের বিবেক বুদ্ধিও রমণীর কটাক্ষে দিনেকের জন্য টলিয়াছিল। সেই একদিন তিনি সুন্দরীর হাতের সিরাজীর পিয়ালা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। যেখানে ঔরংজীবের কঠিন সংযম শিথিল হইয়াছিল, সেখানে বাজীরাওএর দুর্ব্বল চিত্ত যে সহজেই পরাজয় স্বীকার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস তাহার ইতিহাস সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে একখানি সমসাময়িক পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মস্তানীর সহবাসে বাজীরাও পান প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই পত্রের বলে কিনকেইড ও পারসনীস হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রে তাহাদের এক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মস্তানীমহলে অবস্থানকালে বাজীরাও উপপত্নীর সহিত মদ্যপান করিতেন। শ্রীযুত আঠল্যে ও শ্রীযুত রাজবাড়ে, কিনকেইড ও পারসনীসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। মেঘদূতেরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট চিরকালই উহা আদিরসাত্মক কাব্য থাকিবে। সাধারণ বুদ্ধিতে কিনকেইডের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুত গোবিন্দ সখারাম সরদেসাইও কিন্তু রাজবাড়ের

সহিত একমত। তিনি বলেন—বাজীরাও বিষম লম্পট ছিলেন; কিন্তু মদ্যপ ছিলেন না।

বাজীরাও সাতারায় রাজদর্শনে গেলেন; কিন্তু মস্তানীর বিরহ অসহ্য বোধে তাহাকে সঙ্গে লইলেন। রাজার সহিত প্রথম সাক্ষাত ও কুশল সম্ভাষণাদি হইবার পর দুই তিন মাস পর্য্যন্ত তিনি সাতারায় রহিলেন; কিন্তু পূর্ব্বের মত এখন আর তাঁহার দরবারে যাইবার সময় ছিল না। মস্তানীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিবার সাধ্য আর তাঁহার নাই। দরবারে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহার লাম্পট্যের কথা ইতিপূর্ব্বেই রাজার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এই অসৌজন্যের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে পারিলেন না। সে সময় সাতারায় জোশী ও অনগল নামক দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। বাজীরাও-এর সহিত ইঁহাদের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। ছত্রপতি শাহু ইঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বাজীরাওকে গিয়া বলিও, চারি মাস কাল সে এখানে আছে, কিন্তু দুই একবারের বেশী দরবারে আসে নাই। ইদানীং অষ্টপ্রহর কাঞ্চনী লইয়া পড়িয়া থাকে। ইহা ভাল নহে, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিব। যদি তাহার সুবুদ্ধি হয়, উত্তম। জোশী ও অনগল বাজীরাওকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, বহুপ্রকারে ভৎর্সনা করিলেন, নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন, কিন্তু ঈপ্সিত ফল হইল না। বাজীরাও বলিলেন—পূর্ব্বের মত দরবারে যাইব; কিন্তু মস্তানীকে ছাড়িতে পারিব না। আবার তিনি নিত্য দরবারে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বেশী দিন সাতারায় থাকিলেন না। রাজার অনুমতি লইয়া পুনায় ফিরিয়া আসিলেন।

চিমণাজী ও বালাজী এতদিন বাজীরাওকে কিছু বলেন নাই, আশঙ্কা, হয়ত তিনি দুঃখে ক্ষোভে আত্মহত্যা করিবেন। কিন্তু আর চুপ করিয়া

থাকিলে চলে না। পারিবারিক শান্তি, লৌকিক সম্ভ্রম ত নষ্ট হইয়াছেই —অবশেষে রাজদরবারে যে অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তাহাও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। চিমণাজীর অনুরোধে পুরন্দরে প্রভৃতি কয়েকজন ওজনদার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাজীরাওকে মস্তানীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিলেন। গীতার মহা বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতি-ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

হিতবাক্য শুনিবার মত মনের অবস্থা বাজীরাও তখন হারাইয়াছেন। মস্তানী তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, মস্তানীর বিরহে তিলেকে প্রলয় বোধ করেন, তাই পুরন্দরের হিতবাক্যে তাঁহার ক্রোধ হইল। ক্রোধভরে তিনি দেব-দর্শনের ছল করিয়া প্রথম করকুম্ভে ও তথা হইতে পাটসে গেলেন। মস্তানী একাকী পুনার প্রাসাদে রহিলেন। বালাজী বাজীরাও এতদিন যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি মস্তানীকে প্রাসাদের এককক্ষে আবদ্ধ করিয়া বাহিরে চৌকী-পাহারা বসাইলেন। কিন্তু মস্তানী কেবল রূপবতী নহেন, তিনি অসাধারণ চাতুর্য্যশালিনী। বালাজী বাজীরাও-নিয়োজিত প্রহরীদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তিনি আপনার কারাকক্ষ হইতে পলায়ন করিয়া পাটসে স্বীয় প্রণয়পাত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। কিন্তু এবার আর বাজীরাও তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিতে পারিলেন না। মস্তানীর পলায়নকথা প্রকাশ হইবামাত্র পেশবার শুভানুধ্যায়িগণ পাটসে আসিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া, বাজীরাওএর অনুমতি

অনুসারে মস্তানীকে আবার পুনায় পাঠাইয়া দিলেন। মস্তানী পুনায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু প্রিয়তমের প্রাসাদে আর তাঁহার স্থান হইল না। চিমণাজীর উপদেশে বালাজী মস্তানীকে পার্ব্বতী-উদ্যানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, বাজীরাওয়ের সহিত অতঃপর আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

সেকালের নরপতিগণের অনেকেরই উপপত্নী ছিল। প্রহরী-পরিবেষ্টিত প্রাসাদে উপপত্নী সকলে বারাঙ্গনার ন্যায় আচরণ করে নাই। শুদ্ধান্তঃপুরে প্রতিপালিতা গুজরাটের মহিষী কমলাদেবী হেলায় পূর্ব্ব-প্রণয় বিস্মৃত হইয়া দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, পতির শত্রু আলাউদ্দীন খিলিজীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা দেবলাদেবী খিজির খাঁ ও মোবারকের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান ত করিয়াছিলেনই, মোবারকের মৃত্যুর পর হীনবংশজাত কুচক্রী শত্রুর পত্নীত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু মালবপতি বজ-বাহাদুরের উপপত্নী রূপমতী বিষপান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তথাচ আপনার সতীত্ব-গৌরব বিসর্জ্জন করেন নাই। মস্তানীর শেষ জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু প্রবাদ আছে ১৭৪০ সালে বাজীরাওয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মস্তানী হিন্দু সতীর মত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। পাবলগ্রামে মস্তানীর সমাধি আছে।

ইংরাজ নরপতি দ্বিতীয় চার্লসের উপপত্নীগণ, তাঁহার নিকট হইতে বিস্তৃত জায়গীর ও উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। চার্লসের জারজপুত্র ডিউক উপাধি পাইয়াছিলেন, বৃটেনের উচ্চসম্ভ্রান্ত বংশের দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, সম্ভ্রান্ত সমাজে তিনি রাজপুত্র বলিয়া সম্মানিত হইতেন। মস্তানীও বাজীরাও-এর নিকট দুইখানি গ্রাম জায়গীর পাইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র সমসের বাহাদুরকে পেশবা বাজীরাও

ব্রাহ্মণের মত উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতিকুলতায় পরাক্রান্ত পেশবার এই অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই। সমসের বাহাদুর বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী বান্দা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের সামন্ত-পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল মহারাষ্ট্রের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু কুমারীর সহিত। বালাজী বাজীরাও মস্তানীর প্রতি বিরূপ হইলেও সমসেরের সহিত কোনও কুব্যবহার করেন নাই। সমসের তাঁহার নিকট অনুজের আদর ও জনসমাজে পেশবাপুত্রের সম্মান পাইতেন। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র আলিবাহাদুর নানা ফড়নবীসের নির্দ্দেশে মধ্যভারতে মহাদজী সিন্ধিয়ার প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। ইংরাজ লেখক কীন সাহেব পেশবা বাজীরাওয়ের জারজপুত্র বলিয়া ইঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন। আলিবাহাদুরের বংশধরগণ বান্দার নবাব বলিয়া পরিচিত। শেষ নবাব সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যচ্যুত হন। এখন মস্তানী ও বাজীরাওএর বংশধরেরা ইন্দোরে হোলকার রাজ্যে বাস করিতেছেন।

শিবাজীর নৌবহর

সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য সেনাবলের ন্যায় নৌবলেরও প্রয়োজন। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবছত্রপতি এই সত্যটী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোঁকনের উপকুলভাগ অধিকৃত হইবার পরই শিবাজী নৌশক্তি গঠনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন—পেশবা মোরো ত্রিম্বক পিঙ্গলে। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরা আরব সাগরে কেবল বাণিজ্য-তরী ভাসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সেকালে ভারতের পশ্চিম উপকুলে, আরব সাগরের তীরদেশে ও পারস্য সাগরের সন্নিহিত প্রদেশে জলদস্যুর বিশেষ উপদ্রব ছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য-বণিকেরা পণ্যসম্ভার-সংরক্ষণের জন্য বাণিজ্যপোতের পাহারায় রণতরীর বহর নিযুক্ত করিতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে ভারত-সমুদ্রে পাশ্চাত্য শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত জঞ্জিরার হাবশী সর্দ্দারেরাও শিবাজীর সময় পর্য্যন্ত আপনাদের নৌশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই সকল প্রবল প্রতিদ্বন্দীর বিরুদ্ধে নিজের শক্তি কোঁকনের উপকূলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শিবাজী কোঁকন বিজয়ের অব্যবহিত পরে নৌবহর নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা সাদী ও পদাতিকগণ যে অতুল সামরিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাঁহার নৌসৈনিকেরা সেরূপ যশোলাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ সামরিক কৌশল তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্বাভাবিক সম্পত্তি; নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাহাদের মোটেই ছিল না। শিবাজী নিজে একবারের অধিক সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করেন নাই। সভাসদ নৌ-বিভাগের দুইজন অধিনায়কের নাম

উল্লেখ করিয়াছেন—প্রথম দরিয়াসারঙ্গ, জাতিতে মুসলমান; দ্বিতীয় মায় নায়ক, জাতিতে ভাণ্ডারী বা ধীবর। খুব সম্ভব শিবাজী ধীবরদিগের মধ্য হইতেই অধিকাংশ নাবিক নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন—কারণ, মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহারাই সমুদ্রগমনে অভ্যস্ত ও নৌচালনায় নিপুণ। মালবনে শিবাজীর একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে এই মূর্ত্তির মস্তকে কোলী জাতীয় ধীবরদিগের সাধারণ শিরস্ত্রাণ। সম্ভবতঃ শিবাজীর নাবিকেরা সকলেই এইরূপ শিরস্ত্রাণ পরিধান করিত। দরিয়াসারঙ্গ ও মায় নায়ক ব্যতীত দৌলতখাঁ নামক আরও একজন মুসলমান সেনাপতি শিবাজীর নৌবহরে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

সভাসদের মতে শিবাজীর বহরে বিভিন্ন শ্রেণীর ৪০০ রণতরী ছিল। তিনি শিবাজীর রণতরীর মধ্যে গলিবত ও গুরবের সঙ্গে তরাণ্ডী, তারুশিবাড়, মাচবা ও পগারের নাম করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহাদের সকলগুলিকে রণতরী আখ্যা দেওয়া যায় না। গলিবত ও গুরব যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু সভাসদের উল্লিখিত অন্যান্য তরণীগুলিতে বোধ হয় বাণিজ্য ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন সাধিত হইত না।

সভাসদ শিবাজীর রণতরীর যে সংখ্যা দিয়াছেন, তাহাও অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্ট আর্ম বলেন—"The fleet of Shivaji had by this time (1675) been increased to fifty-seven sails, of which fifteen were grabs, the rest gallivats all crowded with men." (ক) অর্থাৎ ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে শিবাজীর রণতরীর সংখ্যা ছিল ৫৭,—ইহার মধ্যে ১৫ খানি গুরব ও বাকী সব গলিবত। সকল রণতরীতেই

(ক) Orme—Fragments. P.—58.

বহু মাল্লার ভিড় দেখা যাইত। ইংরেজ পর্য্যটক ডাঃ ফ্রায়ার খরেপত্তনের পথে রাজাপুরের দক্ষিণে একটি দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত গভীর উপসাগরে শিবাজীর নৌবহর দেখিয়াছিলেন। ঐ বহরে ছোট বড় ৩০ খানি তরণী ছিল। আডমিরালের তরণীর মাস্তুলে তিনি একটী শ্বেত পতাকা দেখিয়াছিলেন। (খ) স্থলপথে কিন্তু শিবাজীর সেনাদলে শ্বেত পতাকা ব্যবহারের কথা শুনা যায় না। অধ্যাপক সরকার শিবাজীর পোতসংখ্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—English reports never put their number more than 160 and usually as 60 only (গ) অর্থাৎ ইংরাজ বণিকদিগের রিপোর্টে শিবাজীর রণতরীসংখ্যা কখনই ১৬০এর অধিক দেখা যায় না, সাধারণতঃ ৬০ খানি মাত্র তরণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, শিবাজীর বহরে সর্ব্বসাকুল্যে ছোট বড় ২০০ খানির অধিক রণতরী ছিল না, এই রণতরীগুলিও আকারে ও গঠনে ইংরাজ রণতরী অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট ছিল। তরণীর অধ্যক্ষ ও নাবিকেরাও যে তরণী চালনায়, রণনৈপুণ্যে ও অস্ত্রবলের হিসাবে ইংরাজ কাপ্তেন ও নাবিকদিগের তুলনায় অত্যন্ত অপকৃষ্ট ছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সত্য বটে দুই একবার শিবাজীর নৌসেনাপতিগণ দুই একবার দুই একখানি পর্ত্তুগীজ জাহাজ ধরিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু সাধারণতঃ পর্ত্তগীজেরা সংখ্যায় এত কম ছিল যে, ইহাতে মারাঠা নাবিকদিগের রণকৌশলের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিবাজী স্থলযুদ্ধে আপনার সেনাপতিগণের উৎকৃষ্টতর রণকৌশলের উপরই নির্ভর করিতেন, সেনাসংখ্যায় মুঘল ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান নরপতিগণের

(খ) Fryer P. 145.

(গ) Sarkar—Sivaji (1st Ed.) P. 336.

সমকক্ষতা লাভের আশা তিনি কখনও করিতে পারেন নাই, কিন্তু জলযুদ্ধে তিনি নৈপুণ্যের অভাব সংখ্যার বলে পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার এই আশা সফল হয় নাই। সুরাটের ইংরাজকুঠীর বড় কর্ত্তা (President) সদম্ভে বলিয়াছিলেন,—One good English ship would destroy a hundred of them without running herself into great danger. একখানি ইংরেজ রণপোত নিজেকে বিশেষ বিপন্ন না করিয়াই একশত মারাঠা রণতরী ধ্বংস করিতে পারে। তাহার গর্ব্ব যে একেবারে অসার নহে, তাহা কোঁকনের সন্নিহিত সাগরে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে।

শিবাজীর রণপোতগুলির মধ্যে 'গুরব' ও 'গলবত'ই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। 'গুরব' পালে চলিত আর 'গলবত' চলিত দাঁড়ে। এই তরণী-গুলির গঠন এরূপ কদর্য্য ছিল যে, সমুদ্রে তরঙ্গ উত্থিত হইলে গুরব ও গলবত অতি প্রবল ভাবে দুলিতে থাকিত। গুরবে ৯ হইতে ১২ পাউণ্ড গুটিকয়েক কামান থাকিত। সভাসদের উল্লিখিত তরণীগুলির মধ্যে মাচবা পালওয়ালা বড় নৌকা; শিবাড় দুই মাস্তলের চেপ্টা-তলা-ওয়ালা নৌকা; শিবাড়ে আবার পাটাতনও থাকিত না; আর পগার সাধারণ ছোট নৌকা (canoe) ব্যতীত কিছুই নহে। বলা বাহুল্য এই সকল তথা-কথিত জাহাজ লইয়া ইংরাজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির সহিত জলযুদ্ধে অগ্রসর হইলে যে পরাজয় হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

ভারত সাগরে মারাঠার নৌ শক্তি স্থাপনের উদ্যম নিষ্ফল হইলেও ইহাতে শিবাজীর দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। জলযুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকিলেও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নৌ-শক্তির জন্য সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্যপোত বহরের বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন।

এইজন্য তিনি কতকগুলি বাণিজ্যতরণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাণিজ্যপোতগুলি মারাঠা পণ্য লইয়া আরব দেশের উপকূলে গমন করিত। কালক্রমে বহু মারাঠা বণিক মস্কট প্রভৃতি আরব বন্দরে আপনাদের পণ্যবীথি স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু সে শিবাজীর তিরোধানের বহু পরে। শিবাজীর রণতরী-বহরের সাধারণ কর্ত্তব্য ছিল—জলদস্যুর উপদ্রব নিবারণ। মারাঠা সৈন্যদল অপরের দেশ লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। মারাঠা নৌ-বহরের খরচও সাধারণতঃ নির্ব্বাহিত হইত অপরের পণ্য লুণ্ঠণ লব্ধ আয়ে। তদ্ব্যতীত আরও দুইটি কার্য্যের জন্য শান্তির সময়েও রণতরী ব্যবহৃত হইত। সেকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন—রাজা। দ্রব্যের মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া উঠিলে রাজা আমদানী শুল্ক কমাইয়া দিতেন, বাজার দামও সেই সঙ্গে কতকটা কমিয়া যাইত। স্থলপথে যেমন বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী হইত, জলপথেও তেমনি দেশী বিদেশী জাহাজে বহু পণ্য আমদানী রপ্তানী হইত। এই জাহাজগুলি মারাঠা বন্দরে শুল্ক দিয়া সরকারী দস্তক লইয়া যাইত। আবার অনেক জাহাজ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ফাঁকি দিয়া বিনা দস্তকেই চলিয়া যাইত। রণতরীর অধ্যক্ষেরা সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দেশী-বিদেশী কোন বাণিজ্যতরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা দস্তক দেখিতে চাহিতেন। দস্তক দেখাইতে পারিলে আর কোন গোল হইত না, না দেখাইতে পারিলে জরিমানা দিতে হইত, না হয়ত জাহাজ বাজেয়াপ্ত হইত। এই কারণে মারাঠা সরকারের সহিত ইংরাজ বণিকদিগের কয়েকবার মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল।

সেকালে কোন দেশের উপকূলে ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে জাহাজ ডুবিয়া গেলে তাহা ঐ দেশের সরকারী সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

এই প্রকারে দৈবলব্ধ সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করা ও উদ্ধার করাও অধ্যক্ষ-দিগের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। ইংরাজদূত অস্কিনডেন শিবাজীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রের উপকূলে নিমগ্ন ইংরাজ বাণিজ্যপোত ও পণ্যদ্রব্য যেন তিনি দাবী না করেন। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে শিবাজী এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হয়েন নাই।

শিবাজীর মৃত্যুর পরে আংগ্রিয়াগণ তৎপ্রতিষ্ঠিত নৌ-শক্তি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। পেশবা বালাজী বাজীরাওএর সহিত আংগ্রিয়া বংশের অন্যতম প্রতিনিধির বিরোধ হইলে তিনি তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধনের সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে ইংরাজের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। আংগ্রিয়ার উপদ্রবে ইতিপূর্ব্বেই ইংরাজেরা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং দুই একবার তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এতদিন এই চেষ্টা সফল হয় নাই; কিন্তু এইবার পেশবার সাহায্যে ইংরাজের অভিলাষ পূর্ণ হইল। গৃহবিবাদের ফলে মারাঠা নৌ-শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। পেশবাদিগের নিজেদেরও নৌ-বহর ছিল; কিন্তু তাহারা শিবাজীর নীতি সম্যকভাবে বুঝিতে না পারার জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক আরব সাগরে মারাঠা শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই।

মহারাষ্ট্রের নিম্ন জাতি ও শিবাজী মহারাজ

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পর্য্যটক থেভেনো (Thevenot) ভারতবর্ষ পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনোজ্ঞ ভ্রমণ বৃত্তান্ত সপ্তদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকেই ইংরাজীতে অনুবাদিত ও লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল। মঁসিয়্য থেভেনো ভারতের নানা প্রদেশের চিত্তাকর্ষক বিবরণের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীর অভ্যুদয় কাহিনীও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। থেভেনোর বিবরণ যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা একবারে তাঁহার পুস্তকের পৃষ্ঠায় চক্ষু বুলাইয়া গেলেই বোঝা যায়। কিন্তু এক বিষয়ে বোধ হয় তাঁহার মন্তব্য একেবারে ভিত্তিহীন নহে। তিনি লিখিয়াছেন যে, শিবাজী প্রথম কতকগুলি দস্যু লইয়া তাঁহার সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। শিবাজীর দলে অভিজাত শ্রেণীর লোকের অভাব ছিল না। বহু সম্ভ্রান্ত দেশস্থ ব্রাহ্মণ এই তরুণ জননায়কের অসমসাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া অথবা হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকল্পে তাঁহার আদর্শের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিলেন। বহু উচ্চবংশজাত মারাঠা বীরও এই মারাঠাকুলপ্রদীপের প্রতিভা-জ্যোতিতে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর প্রভু বংশীয় দেশপাণ্ডেরাও দেবতার নামে "হিন্দবী স্বরাজ্য" প্রতিষ্ঠার আয়োজনে শিবাজীর পৃষ্ঠপোষকতা করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল অভিজাত শ্রেণীর লোক লইয়া সৈন্যদল গঠন করা যায় না,—সৈন্যদলে কেবল হুকুম করিবার লোক থাকিলেই হয় না, হুকুম তামিল করিবার লোকও চাই। জাতীয় মহাসমরে জাতির সকল স্তরের লোকের সহায়তা দরকার, মস্তিষ্ক ও বাহু উভয়ের সহযোগিতা ভিন্ন

দেশের কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাই তীক্ষ্ণদর্শী শিবাজী মহারাজ সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই আপনার পতাকামূলে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বীয় চরিত্র প্রভাবে সমাজের সকল স্তরের লোকেরই চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মহাব্রত উদ্‌যাপনে রামদাস স্বামীর ন্যায় মহাপুরুষও যেমন অকাতরে সহায়তা করিয়াছেন, তেমনি কতগুলি চৌর্য্য ব্যবসায়ী দস্যু-তস্কর-শ্রেণীর অসাধু ইতর জাতীয় লোকও তাহাদের বাহুর শক্তি, চরণের ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধির কৌশল শিবাজীর সেবায় নিয়োগ করিয়াছিল। শিবাজীর মাওলী সেনা দরিদ্র লইয়া গঠিত। মাওলীদের পেটে অন্ন ছিল না, পরিধানে বসন ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে সাহস ছিল, অন্তরে নিষ্ঠা ছিল—আর সেই গুণাবলীর আদর হইয়াছিল শিবাজীর নিকট। তাহার আগেও হয় নাই, তাহার পরেও বেশীদিন হয় নাই। কিন্তু দরিদ্র মাওলীরা দস্যু নহে। মহারাষ্ট্রের কোলী, মহার ও রামোশীরাই তস্কর বলিয়া বিখ্যাত।

ইহাদের মধ্যে রামোশীরাই সমধিক দুর্দ্ধান্ত। কেহ কেহ বলেন যে ইহারা মহিষুর রাজ্যের বেরডদিগের জ্ঞাতি। একজন বেরড বীর শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে রামোশী ও বেরড এক নহে। মহারাষ্ট্রে কখন্ যাযাবর রামোশী জাতি প্রবেশ করিয়াছিল তাহা স্থির করা কঠিন। কোন্ পথে, কোথায় তাহারা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহা স্থির করাও সহজ নহে। ১৮৩৮ সালে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত An Account of the Origin and the Present Condition of the tribe of Ramoosies নামক গ্রন্থে কাপ্তেন আলেকজেণ্ডার ম্যাকিণ্টস্ প্রচলিত প্রবাদ হইতে ইহাদিগের আদি বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা

করিয়াছেন। মারাঠা আমলে রামোশীরা দুর্গে ও পল্লীগ্রামে প্রহরীর কার্য্য করিত, চাষবাসও করিত। গিরি দুর্গে প্রহরীর কার্য্যের জন্য তাহারা কিছু নিষ্কর জমি পাইত।

গ্রামের কাজের জন্য মিলিত, কোথাও বা কিছু নগদ মুদ্রা, কোথাও কিছু শস্য। তাহাদের সর্দ্দারেরা হয়ত বিজয়াদশমীর দিন গ্রামবাসী-দিগের নিকট একটা হৃষ্ট-পুষ্ট মেষই উপহার পাইত। এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ীদিগের পণ্যদ্রব্য রক্ষা করিবার দায়িত্বের জন্যও তাহাদের একটা পাওনা ছিল। এই সকল প্রাপ্যে তাহাদের পেট ভরিত না। তাহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রকৃত পেশা ছিল চৌর্য্যবৃত্তি বা ডাকাতি। জঙ্গল ও পাহাড়ের ভিতর দিয়া গুপ্ত পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে, আরণ্য পশুর ডাকের সঙ্কেতে নানাদিক হইতে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মিলিত হইতে, সংখ্যায় অল্প হইলেও অসম সাহসের সহিত বহুলোকরক্ষিত ঘরবাড়ী আক্রমণ করিতে, বিভিন্ন বনপথে ক্ষিপ্রভাবে পলায়ন করিতে, ছদ্মবেশে গ্রামে বা শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে ইহারা অদ্বিতীয়। নিশাকালে ইহারা অকুতোভয়ে শ্বাপদ-সঙ্কুল বনপথে ভ্রমণ করে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বন্য পশুর হস্তে রামোশীর প্রাণ যাওয়ার কথা বড় একটা শুনা যায় না। অতি সামান্য জঙ্গলের মধ্যেও ইহারা ঠিক বন্য পশুর মত সহজে এবং সম্পূর্ণরূপে লুক্কায়িত হইতে পারে। মহারাষ্ট্রে ইংরাজী আমল আরম্ভ হইবার পরও ইহাদের উৎপাত কমে নাই। রামোশী দস্যু উথিয়া বা উথাজীর উৎপাতে বহুদিন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে, এবং তাহাকে ধরিতে ইংরাজ সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শোনা যায় যে রামোশী দস্যুরা একরাত্রিতে কখনও কখনও ত্রিশ চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে।

এই সকল রামোশী দস্যু এমন দুর্দ্দান্ত যে একবার একজন রামোশী দুষ্কৃতকারীর দণ্ডের জন্য পেশবা দ্বিতীয় মাধব রাওর জননী গঙ্গাবাঈকে অন্নজল ত্যাগের ভয় দেখাইতে হইয়াছিল। ম্যাকিণ্টস সাহেব বলেন যে রামোশী বৃদ্ধদিগের মতে শিবাজীই তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে রাষ্ট্রের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বহু পুরুষ পর্য্যন্ত চৌর্য্য ও তস্কর বৃত্তিতে লিপ্ত থাকায় রামোশী-চরিত্রের যে বৃত্তিগুলি বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল, গিরিদুর্গের গুপ্তবর্ত্ম প্রভৃতি আবিষ্কারে, শত্রুর গতি-বিধি ও শত্রু-শিবিরের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহে সেই গুণগুলিই বিশেষ আবশ্যক। তাই শিবাজী এই ডাকাতের দলকে দেশের সেবায় ডাকিলেন, আর তাঁহার ব্যক্তিত্বের এমনই প্রভাব ছিল যে, এই নরহন্তা দস্যুরা যে কেবল শিবাজীর অধীনে দেশের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে দুই একজন নেতার নাম মারাঠা ইতিহাসে একেবারে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। আজিও রামোশীরা শিবাজীর নামে সম্ভ্রমে মস্তক নত করে। এইখানেই শিবাজীর প্রকৃত মহত্ত্ব।

মহারাষ্ট্রের নিম্নজাতির মধ্যে কেবল যে রামোশীদিগকেই তিনি দেশের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। রামোশীদিগের মত না হউক, দস্যু-বৃত্তির জন্য মহারদিগেরও কতকটা অখ্যাতি ছিল। মহারের জাতিগত পেশা পল্লীরক্ষা—কিন্তু পল্লী-প্রাচীরের ভিতরে এই অসভ্য জাতির স্থান ছিল না, গ্রামের মহার পাড়া গ্রামের বাহিরে; সেইখানে ক্ষুদ্র অপরিসর, অপরিষ্কার কুটীরে মহারেরা পশুর মত জীবন যাপন করে। রামোশীদিগের মত চৌর্য্যই মহারের কৌলিক বৃত্তি নহে। চোখা মেলার মত পরম বৈষ্ণবও মহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর পূর্ব্বেও তাহারা পল্লী সেবা করিত। শিবাজী তাহাদিগকে কোন কোন দুর্গ রক্ষার ভার

দিয়াছিলেন। কোলী, রামোশী ও মহারেরা কিন্তু দুর্গের ভিতরে থাকিতে পাইত না। তাহাদের স্থান ছিল দুর্গের বাহিরে। শত্রুসেনার আক্রমণ হইতে গিরিপথ রক্ষা করা, শত্রুসেনার আগমন সংবাদ জানাইয়া দুর্গরক্ষকদিগকে সতর্ক করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত রামোশী ও মহারদিগের সাহায্যে শিবাজী গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

মুসলমান আমল হইতে ইংরাজী আমলের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত কোলী দস্যুর উৎপাতে মহারাষ্ট্রের গিরিপথগুলি মোটেই নিরাপদ ছিল না। মারাঠা সরকার ইহাদের সঙ্গে একটা রফা করিয়াছিলেন। কোলী নায়কেরা পথিকদিগের নিকট হইতে একটা মাশুল আদায় করিত এবং এই অধিকারের বিনিময়ে রাজপথের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিত। পেশবার পতনের পর এলফিনষ্টোন সাহেবও কিছুদিন এই ব্যবস্থাই চালাইয়াছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে ইংরেজের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর কোলী দস্যুদের উপদ্রব কমিয়া গিয়াছে। মুসলমান আমলে ইহাঁদের উপদ্রবে দক্ষিণ ভারতের বড় বড় পথগুলি কিরূপ বিপদ-সঙ্কুল হইয়াছিল তাহার বিবরণ বহু বিদেশী পর্য্যটকের গ্রন্থে পাওয়া যায়। শিবাজী মহারাজ এই কোলীদিগকেও নিজের কাযে লাগাইয়াছিলেন, বন্য বর্ব্বর বলিয়া তুচ্ছ করেন নাই।

তিনিই প্রকৃত জননায়ক, যিনি সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোককে রাষ্ট্র সেবার অধিকার দেন এবং সে অধিকারের সুব্যবহার করিতে উৎসাহ দেন। শিবাজীও প্রকৃত জননায়ক ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে ছিল দেশের অদম্য অখণ্ড জনশক্তি নতুবা মহারাষ্ট্রের সামান্য জায়গীরদার-পুত্রের সাধ্য কি যে আলমগীর বাদশাহের সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেয়?

সাতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ

মারাঠা সাম্রাজ্যের গাঁথুনী ছিল বড়ই আল্‌গা, তাই ইংরাজেরা দুইটা যুদ্ধেই অমন বিরাট রাজ্যটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের আসল কর্ত্তা পেশবা পুনার প্রাসাদ হইতে হুকুম চালাইতেন; যাঁহার নামে হুকুম চলিত, সেই ছত্রপতি মহারাজ সাতারার কেল্লায় একরকম বন্দী ছিলেন। রাজ্যটা নামে ছিল তাঁহার, তিনিই পেশবার মনিব, তাঁহার সৈন্য সামন্তদের মনিব, জায়গীরদার ও সাধারণ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় খুব ধুমধাম হইত, তাঁহার বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় হইত, তাঁহার উত্তরাধিকারী জন্মিলে কেল্লার কামান সহস্র গর্জ্জনে সেই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিত, সাতারার সান্নিধ্যে আসিলে পেশবার নাগারাও স্তব্ধ হইত, বাহিরে ছত্রপতির সম্মান ছিল এতখানি। হাজার হউক, তিনি ত শিবাজী মহারাজের বংশধর। আসলে কিন্তু তিনি ছিলেন পেশবার হাতের একটি পুতুল। সাতারা ছাড়িয়া এক পা চলিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার চাকর বাকর পর্য্যন্ত পুনা হইতে আসিত। তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলে পেশবার মুখের দিকে চাহিতে হইত। প্রাসাদের জলের নলটা মেরামত করিতে হইলে পেশবার দরবারে আরজি পাঠাইতে হইত। সে আরজি যে সর্ব্বদাই মঞ্জুর হইত, তাহাও নহে। তথাপি রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে তাঁহার কদর বাড়িয়া যাইত। চতুর রাজনীতিবিদ্‌ বালাজী জনার্দ্দন ওরফে নানা ফড়নবীশ ছত্রপতির ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করিয়া পেশবাকে জব্দ করিবার মতলব করিয়াছিলেন। আর তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে যখন বার বার পরাজিত হইলেও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের

সামন্তবর্গ দ্বিতীয় বাজীরাওকে ত্যাগ করিলেন না, তখন ইংরাজ নিজের সুবিধার জন্যই ছত্রপতি প্রতাপসিংহের "নামের দোহাই ফিরাইলেন।"

মারাঠা জাতির চরিত্রের একটা বিশেষ দৌর্ব্বল্য এই যে, সমৃদ্ধির দিনে তাহারা জাতীয় একতার কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। আত্মকলহপরায়ণ মারাঠা সর্দ্দাররা পরস্পরের গলায় ছুরি চালাইয়া দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন না। এইরূপ কলহের দৃষ্টান্ত মারাঠা ইতিহাসে অনেক আছে।

দ্বিতীয় মাধব রাও-এর অপমৃত্যুর পর প্রধানতঃ উত্তরাধিকার লইয়া এই গৃহকলহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। গদীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন রঘুনাথ-পুত্র বাজীরাও। কিন্তু মন্ত্রী নানা ফড়নবীশের ইচ্ছা ছিলনা যে, বাজীরাও পুনার মসনদে বসেন। অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক চক্রান্তের পর বাজীরাওই পেশবা হইলেন, প্রধানতঃ দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশের সাহায্যে। দৌলতরাও একটা বিশাল সেনাদলের নায়ক, ফিরিঙ্গি সেনাপতি ডিবয়েনের সুশিক্ষিত সৈন্যদল তাঁহার ইঙ্গিতে চলিত; আর বুদ্ধিবলে সেকালে নানার সমকক্ষ কেহই ছিল না। বাজীরাও স্থির করিলেন, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিবেন। সিন্ধিয়ার সাহায্যে নানার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিলে তাহার পর সিন্ধিয়ার বিষদাঁত ভাঙ্গিতে কতক্ষণ? এই কূটনীতির ফলে যে গৃহবিবাদের উৎপত্তি, তাহাতেই মারাঠা সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছে। সিন্ধিয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, নানার পতনের পর সিন্ধিয়াই কার্য্যতঃ পেশবার প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন। দৌলতরাও-এর স্বার্থসাধনের সহায়তা করায় যশোবন্তরাও হোলকর পেশবা ও সিন্ধিয়া উভয়েরই শত্রু হইলেন। মধ্যভারতে সিন্ধিয়ার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বৈরনির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর যশোবন্ত তাঁহার বিজয়ী সেনা লইয়া পুনা নগরের নিকট যখন উপস্থিত

হইলেন, তখন সিন্ধিয়া ভয় না পাইলেও পেশবা প্রমাদ গণিলেন। পেশবা ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত করিয়া যশোবন্তরাও হোলকর পুনায় প্রবেশ করিলেন, আর বাজীরাও ইংরাজের আশ্রয় লইতে সমুদ্রের উপকূলে পলাইয়া গেলেন। পেশবার শূন্য গদীতে বিজয়ী হোলকর বাজীরাওয়ের ভ্রাতুস্পুত্র বিনায়করাওকে বসাইয়া দিলেন।

তখন ভারতীয় ইংরাজ রাজ্যের বড়লাট সুপ্রসিদ্ধ লর্ড ওয়েলেসলী। ওয়েলেসলী এ দেশে আসিয়াই দেশী রাজ্যগুলিকে পদানত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দুর্ব্বল নিজাম তাঁহার প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রাজ্য আজও টিকিয়া আছে। মহিষূরেরশার্দ্দূল টিপু-সুলতান ইংরাজের চরণে আপনার স্বাধীনতা ও সম্মান বিকাইয়া দিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রাসাদে বিলাসীর জীবন যাপন করিতে সম্মত হইলেন না। চক্ষুর নিমিষে তাঁহার রাজ্য লাল হইয়া গেল। ইংরাজ দূত পেশবা ও সিন্ধিয়ার দরবারেও ওয়েলেসলীর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন; অতঃপর ইংরাজ সেনাই পেশবার রাজ্য রক্ষা করিবে, পেশবা কেবল তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর সুখে স্বচ্ছন্দে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বিনা ওজর-আপত্তিতে পুনার মসনদ ভোগ দখল করিতে থাকুন। বাজীরাও স্বার্থপর, কুটিল ও কাপুরুষ; কিন্তু নির্ব্বোধ নহেন। তিনি ইংরাজের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। পুনা ছাড়িয়া তিনি যখন বেসিনে পলায়ন করিলেন, তখন বড়লাট ওয়েলেসলী সুযোগ বুঝিয়া আবার সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বেসিনের সন্ধিতে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া দ্বিতীয় বাজীরাও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন (তখন আর্থার ওয়েলেসলী) তাঁহাকে পুনায় নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিলেন।

মারাঠা চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, বিপদের দিনে তাহারা জাতীয় ঐক্যের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করে। বাজীরাও বেসিনে ইংরাজের পদে স্বাধীনতা বিকাইয়া আসিয়াছেন, এই কথা প্রচার হইবামাত্রই সিন্ধিয়া ও হোলকর পূর্ব্ব-বৈর বিস্মৃত হইলেন। নাগপুরের অলস রাজা রঘুজী ভোঁসলা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পেশবাও গুপ্তভাবে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল; সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, হোলকর একে একে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ইংরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন।

পরাজিত মারাঠা সেনানায়করা কিন্তু তখনও পরাধীনতায় অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। তাই যখন লর্ড ময়রা পিণ্ডারীযুদ্ধে লিপ্ত, সেই সময় আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই যুদ্ধের ইতিহাস লইয়া ইংরাজ লেখকে ও এদেশী পাঠকে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজী ইতিহাস লেখক বুঝিতে পারেন না, রাষ্টিয়া ভিঞ্চুরকর, পটবর্দ্ধন প্রভৃতি যে সকল সর্দ্দার অল্পকাল পূর্ব্বে পেশবা কর্ত্তৃক নিগৃহিত ও নির্যাতিত হইয়াছিলেন, তাহারা কেন পেশবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন; ইংরাজের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য খেয়াল বা নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ, কিন্তু ইহা অপেক্ষা স্বদেশপ্রাণতার আর বড় প্রমাণ কি আছে? পেশবার অন্যতম মন্ত্রী মোরোদিক্ষীত একজন ইংরাজ সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন—"জানি, এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হইবে, তাই আমি পেশবাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে আমি নিষ্ক্রিয় থাকিব না।" মোরো দিক্ষীত যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজয় অনিবার্য্য জানিয়াও বিপন্ন প্রভুকে ত্যাগ করেন নাই। পেশবা যুদ্ধ ঘোষণা করিবামাত্র নাগপুরে ইংরাজের বন্ধু আপ্পা সাহেবও যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন, হোলকরের সৈন্যদল চঞ্চল হইয়া

উঠিল, সিন্ধিয়াও একেবারে স্থির রহিলেন না। কিন্তু তৃতীয় মারাঠা-যুদ্ধেও মারাঠা জাতির অদৃষ্ট ফিরিল না। খরকী, সীতাবলদী ও মেহিদপুরে পেশবা, ভোঁসলা ও হোলকারের সৈন্যদল পরাজিত হইল। এ যুদ্ধ চলিয়াছিল অনেকদিন। স্বাধীনতার জন্য মারাঠাদিগের ইহাই শেষ যুদ্ধ বলিলেও চলে। অনেক সেনানীই প্রথম পরাজয়ে হতোদ্যোম হয়েন নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে গোঁয়ার বলেন, বোকা বলেন। আমরা এ দেশ-বাসীরা কেমন করিয়া তাহাতে সায় দিব?

পরাজিত পেশবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। যত দিন সেনাপতি বাপু গোখলে জীবিত ছিলেন, যতদিন পর্তুগীজ সেনানী মেজর ডি পিণ্টো জীবিত ছিলেন ততদিন পেশবার বাহিনী একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই। তাই ইংরাজ সেনানী-দিগকে বড় সাবধানে চলিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টা হইল কেমন করিয়া পেশবার সামন্তবর্গকে নিজেদের দলে টানিয়া আনিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তিগতভাবে এই সর্দ্দারদিগের পেশবার প্রতি কোন অনুরাগের কারণ ছিল না। কেবল জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য তাঁহারা পেশবার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন পেশবাই তাঁহাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। তাই সার টমাস মনরো যখন সসৈন্যে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল, তিনি যেন গোখলে ব্যতীত অপর সর্দ্দারদিগের জমিদারীতে উৎপাত না করেন। তাহাদিগের সহিত যেন বন্ধুবৎ ব্যবহার করা হয়। (Treat the country immediately under the Peshwa and the Jagheer of Goklah' as hostile, and that of all the other Jagheer-dars as friendly) কিন্তু ইহাতেও কি তাঁহারা দক্ষিণের জায়গীরদারগণের

মন পাইয়াছিলেন ? পেশবার পতনের পরও পটবর্দ্ধন বংশীয় চিন্তামন রাও আপ্পা ইংরাজের চাকরী করিতে সহজে সম্মত হয়েন নাই। ইংরাজ লেখকরা এই অসম্মতি চিন্তামন রাও এর characteristic petulence and irritability of his disposition বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কি কেবলমাত্র petulance, কেবল মাত্র রুক্ষ স্বভাবেরই নিদর্শন ?

চিন্তামন রাও ইংরাজ সেনানীদিগের পত্রের অভদ্র উত্তর দিয়া পরে অসুস্থতার জন্য বাজীরাওয়ের সেনাদল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল কি ইংরাজ সেনানীর বন্ধু ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াই তিনি বাজীরাও-এর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? বোধ হয় না। ইতোমধ্যে চতুর ইংরাজ লাট আর এক চাল চালিয়াছিলেন।

রাজ্যের প্রকৃত মালিক সাতারার ছত্রপতি। পেশবা তাঁহার ভৃত্য মাত্র। রাজা ঠিক থাকিলে মন্ত্রী বদলে রাজ্যের আর ক্ষতি কি ? তাই ইংরাজ সরকার ঠিক করিয়াছিলেন, ছত্রপতির নামে ঘোষণা পত্র জাহির করিলে মারাঠারা অবশ্যই পেশবার পক্ষ ছাড়িয়া আসিবে। পেশবাও ইহা জানিতেন। তাই পলায়নকালে তিনি ছত্রপতি মহারাজকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। আষ্টির যুদ্ধে বাজীরাও কেবল যে অনুগত সেনাপতি গোখলেকে হারাইয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু এই যুদ্ধের পরেই ছত্রপতি মহারাজ ইংরাজের হস্তে নিপতিত হয়েন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ইংরাজ সরকার স্থির করিয়াছিলেন, ছত্রপতি মহারাজকে সাতারার সিংহাসন দেওয়া হইবে। আপনাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই তাঁহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—ছত্রপতির উপকারের জন্য নহে। কোন কোন ইংরাজ লেখক এই কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। এইচ, টি প্রিন্সেপ্ সে কালের বঙ্গদেশীয়

সিভিলিয়ন। তিনি এই যুদ্ধের সময় বড়লাটের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বহু স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। বড়লাটের খাস দপ্তরের কর্ম্মচারী হিসাবে অনেক খবর জানিবার সুবিধাও তাঁহার ছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি Narrative of the Political and Military Transactions in India নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সে কালে বিলাতে এই গ্রন্থের খুব আদর হইয়াছিল। তাই বিলাতে ফিরিয়া প্রিন্সেপ্ আবার ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে History of the Political and Military Transactions in India নাম দিয়া দুই খণ্ডে এই বহির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করেন। প্রথম সংস্করণের বহিখানি পড়িবার সুবিধা আমার হয় নাই। সুতরাং সাতারার রাজার সম্বন্ধে তিনি প্রথম সংস্করণে কি বলিয়াছিলেন, জানি না, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের বহি একখানি আমার কাছে আছে। এই বহিতে প্রিন্সেপ্ ইংরাজ সরকারের মনোভাব একেবারে খুলিয়া বলিয়াছেন।

"The Raja of Satara was to be established in a territorial possession, to be held either as a dependent Jageer, or as a distinct sovereignty, under stipulations securing the supremacy of the British Government. The declared object of this part of the plan was to concilliate the Mahrattas to the new order of things, and establish a counterpoise to the remaining influence of the Peshwa's Brahminical administration. The mode and form, and amount of the provision, were left to Mr. Elphinstone's discretion, so that the object might be most securely attained. The above,

with a terriotrial reservation for the settlement of a Jagheer upon Chimna Appa, formed the outline of the plan devised by the Marquess of Hastings ; in prosecution of which, immediately upon the capture of Satara, the Mahratta flag was again hoisted on its walls, in the manner above mentioned, and a proclamation issued, inviting the Mahrattas to rally round their rightful hereditary sovereign, for whom it was declared, that Satara and adjacent territories would be reserved as an independent dominion under British protection. In this form, Mr. Elphinstone thought, the establishment of the Satara Raja would be effected with most advantage under existing circumstances ; and the early submission of several Jageerdars, who were eager to establish a prior claim to the honours and advantages of the restored dynasty, attested the policy of the measure". সোজা কথা এই যে, সাতারার রাজার দোহাই দিয়া পেশবার দলস্থ সর্দ্দারদিগকে ফিরাইয়া আনাই ইংরাজ সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেইজন্যই তাঁহারা সাতারার দুর্গ-প্রাকারে বৃটিশ পতাকা না উড়াইয়া শিবাজীর নিশান চড়াইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা নাবালক ছত্রপতিকে ছোট একটা স্বাধীন রাজ্যের তক্তে বসাইয়াছিলেন, তাই বাই নগরে যাইয়া এলফিনষ্টোন দক্ষিণের শিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে অভয় দিয়াছিলেন—"ভয় নাই, ইংরাজ সরকার তোমাদের

বৃত্তিলোপ করিবে না, তোমরা যে নিষ্কর জমি সম্ভোগ করিতেছ, তাহা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিবে, পবিত্র পণ্ঢরপুর তীর্থে বিষ্ণু-মন্দিরের নিকট ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে পেশবা বাজীরাও গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা হত্যা করাইয়াছে, আমরা কেবল সেই ব্রাহ্মণ-হত্যার প্রতিবিধান করিতে চাহি।" ছত্রপতির স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরাজদের ব্যাকুল হইবার কারণ ছিল না।

কিন্তু ছত্রপতি এত কাল নামে অন্ততঃ মারাঠা সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি না মনে করেন যে, ইংরাজ আবার তাঁহার সমস্ত লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধার করিয়া দিবে। মুর্শিদাবাদের একজন নবাব না কি তাঁহার জমাখরচের হিসাবে স্থবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার খাজনা জমা দিয়া, তাহা হইতে ইংরাজ কোম্পানীর বেতন খরচ লিখিয়া বাকীটা নিজের ঘরে খরচা লিখিতেন। ছত্রপতিরও সেইরূপ করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যই ইংরাজ সরকার নানারূপে তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষমতার সীমা কোথায়। তাঁহার সহিত যখন পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়, তখন আর ইংরাজের ততটা উদ্বেগের কারণ নাই। প্রিন্সেপ লিখিয়াছেন—

On the 25th of September 1819, the engagement fixing relations of the Raja with the British Government was settled by the same officer. Under its stipulations the territory is to be held in subordinate co-operation with the British Government, and the provisions fixing the Raja's future dependence are more than usually precise. It was particularly agreed, that, for some time to come, the tract should remain

under "the management of British offcers; that the Jageers should always be under the management of British officers, that the Jageers should always be under our guarantee, and in the event of a transfer, that the Raja should conform to the British system, in the management of his customs, besides surrendering criminals. With so many occassions for interference, the Raja's authority can never be looked upon as independent."

পরবর্ত্তী কালে ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ ও তাঁহার উকীলরা তর্ক তুলিয়াছিলেন যে, নাগপুরের ভোঁসলা-রাজা প্রভৃতি অন্যান্য মারাঠা নরপতিগণ সাতারার সামন্ত বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কেন না, ছত্রপতি মহারাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহার অবাধ্য ভৃত্য পেশবার আচরণের জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না। আইনের তর্কে হয় ত এ যুক্তি অগ্রাহ্য না হইতে পারে। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে এ যুক্তি গ্রহণ করা দুষ্কর। ছত্রপতি-ত নামে মাত্র পেশবার মনিব ছিলেন। এরূপ যুক্তিগ্রহণ করিলে ছত্রপতির দাবীও নাকচ হয়, কেন না, যদি যুধিষ্ঠিরের বংশধর কোথাও থাকে, তবে ছত্রপতির দাবী অপেক্ষা তাহার দাবী প্রবল হইবে। এই প্রণালী অনুসরণ করিলে বোধ হয়, দিল্লীর সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী খুঁজিতে যাইতে হইবে কোল-ভীল-নাগা-কুকি-সাঁওতাল-মুণ্ডাদিগের মধ্যে।

যাহা হউক, ইংরাজের অনুগ্রহে নাবালক প্রতাপ সিংহ সাতারার সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার অভিভাবক হইলেন—কাপ্তেন জেমস্ গ্রাণ্ট। গ্রাণ্ট ডফ নামে ইনি ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। মারাঠাদিগের ইতিহাস

লিখিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। গ্রাণ্ট ও এলফিনষ্টোন" ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের বুদ্ধিমত্তা ও শাসন দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ প্রাচীন রীতি-নীতির আলোচনা করিয়া দেশের আইন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি টেবল চেয়ায়ে বসিয়া সেকালের সিবিলিয়ানদিগের মত বিনা আড়ম্বরে নিজের কাজ করিয়া যাইতেন। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষ, মহাত্মাও নহেন, দুরাত্মাও নহেন। সাধারণ মানুষের মত তাঁহার অনেক গুণ ছিল, আবার রাজ বংশের লোকদিগের সাধারণতঃ যে সকল দোষ থাকে, তাহা হইতেও তিনি একেবারে মুক্ত ছিলেন না। গ্রাণ্ট ডফ তাঁহাকে ভালবাসিতেন—বিলাতে যাইবার পর তিনি ছত্রপতির জন্য অনেক বেলোয়ারী জিনিষ কিনিয়াছিলেন, অবশ্য ছত্রপতিরই প্রদত্ত অর্থে।

যাহা হউক, প্রতাপসিংহের সমৃদ্ধি ও সুখের দিন চিরস্থায়ী হয় নাই। তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন বালাজী পন্ত নাতু। বালাজী পন্ত নাতুকে ধিক্কার না দেয়, এমন লোক মহারাষ্ট্রে নাই বলিলেও চলে। নাতু সাতারার দেওয়ানের পদ চাহিয়াছিলেন ; প্রতাপ সিংহ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। পেশবার রাজ্য নাকি নাতুর চক্রান্তেই নষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং ছত্রপতি নিজ রাজ্যের ভার তাঁহার হাতে দিতে পারিলেন না। নাতু ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন---প্রতাপ সিংহকে সাতারা হইতে তাড়াইয়া। কথিত আছে যে, বাজীরাওয়ের একখানি সাধারণ পত্রের কদর্থ করিয়া নাতু ইংরাজ এজেণ্ট কর্ণেল ওভান্সের মন কলুষিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহের দ্বিতীয় শত্রু তাঁহার নিজের সহোদর। কনিষ্ঠ আপ্পা সাহেব সিংহাসনের লোভে জ্যেষ্ঠের শত্রুদলে যোগ দিয়াছিলেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ সিংহ সাতারার সিংহাসনারোহন করেন, ১৮৩৬

খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হয়। তিনি নাকি কোম্পানীর দেশীয় সৈন্যদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই অভিযোগের ফলে তিনি রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হয়েন। সংক্ষেপে ইহাই হইল, ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তাঁহার ভ্রাতা আপ্পা সাহেব অপুত্রক ছিলেন, তাই কাল-ক্রমে সাতারার রাজ্য ইংরাজের অধিকারে আইসে।

এখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। রণজিতের রাজ্য গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার ভৃত্য গোলাব সিংহের বংশধর আজিও কাশ্মীরের গদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। নিজামের বংশধর আজ বেরার পাইবার জন্য আবেদন ও আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু ঔরংজীবের বংশধররা আজ কোথায়? শুনিয়াছি, দিল্লীর বাদশাহের একজন বংশধর দিল্লী শহরের কোন পল্লীতে দপ্তরীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। টিপুর বংশধরগণের স্থান মহীষুরে হয় নাই। সিন্ধিয়া আছেন, হোলকার আছেন, কিন্তু পেশবা কোথায়? কোলহাপুরে শিবাজীর বংশধর ইংরাজের ছত্রচ্ছায়ায় রাজত্ব করিতেছেন; কিন্তু সাতারার শাহুর দরবারে এখন ইংরাজ জজের আফিস বসিয়াছে। ইহার কারণ অনুধাবন করিয়া দেখা দরকার।

আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। আত্মরক্ষা-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই ইংরাজ দিল্লীর বাদশাহী, রণজিতের রাজত্ব, পেশবার প্রভুত্ব লুপ্ত করাইয়া দিয়াছে। সেই কারণেই ছত্রপতির ছত্র কাড়িয়া লওয়ার প্রয়োজনও ইংরাজের হইয়াছিল। এ কথা বেশ সহজেই বুঝা যায় যে, ঔরঙ্গজীব, রণজিৎ, বাজীরাও ও শিবাজীর বংশধরকে কেন্দ্র করিয়াই এ দেশে বিপ্লবের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারিত। তাই ইংরাজ পূর্ব্বাহ্নেই ইঁহাদের শক্তির মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রয়োজনের জন্য

তাঁহাকে ইহা করিতে হইয়াছে, সাধারণ আইনের ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া চলিলে রাজ্য রক্ষা পাইত না।

অল্পদিন হইল, এলাহাবাদ প্রবাসী বিখ্যাত বাঙ্গালী ডাক্তার মেজর বামনদাস বসু পরিণত বয়সে প্রতাপসিংহের রাজ্যচ্যুতি সম্বন্ধে একখানি বিরাট ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বহুদিন পূর্ব্বে সাতারার সিভিল সার্জ্জন ছিলেন, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হইয়াছে, মারাঠা জাতির ইতিহাস তিনি সহানুভূতি সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং ছত্রপতি প্রতাপসিংহের রাজ্যচ্যুতির করুণ ইতিহাস লিখিবার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্র ত্যাগ করিবার পরেও মারাঠা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজী ও মারাঠী ভাষায় বহু আলোচনা হইয়াছে। এলাহাবাদে থাকিয়া তিনি হয়ত বিগত কয়েক বৎসরের ঐতিহাসিক গবেষণার সম্যক্ সংবাদ রাখিতে পারেন নাই ; এই জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, গ্রন্থখানি তিনি অপর কাহারও দ্বারা দেখাইয়া লওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। যুরোপে হইলে এরূপ কাজের ভার স্বভাবতঃই কোন ব্যবসায়ী ঐতিহাসিকের উপর পড়িত। সে সব দেশে, great amateur-দিগের যুগ অতীত হইয়াছে। এদেশে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও amateurএর যুগই চলিতেছে। ঐতিহাসিক মাল-মসলা, দলীলদস্তাবেজ যোগ্যতা সহকারে ব্যবহার করিতে পারেন, এমন লোক এ দেশে দুর্ল্লভ। সুতরাং মেজর বসু যে গ্রন্থখানি সম্পাদনের ভার একজন amateur-এর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। বিশেষতঃ সে দলের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

রামানন্দ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ইংরাজীতে সুলেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য তিনি সংস্কৃত ও লাটিন ভাষাও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি গোয়া নিবাসী অধ্যাপক পাস্তরঙ্গ পিস্থর লেঁকরের ফরাসী ও পর্টুগীজ ভাষায় লিখিত দুইখানি গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানির আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ধর্ম্মমত। সুতরাং রামানন্দ বাবু কেবল যে ফরাসী ও পর্টুগীজ ভাষায় পণ্ডিত তাহা নহে; তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে সাহায্য করিয়াছেন। 'মডার্ণ রিভিয়ুর' সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি পরলোকগত উইলিয়ম আর্ভিন বিরচিত Later Moghuls নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মারাঠি ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেন না ঐ প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সখারাম সরদেসাই মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সরদেসাই মহাশয়ের উক্ত মত মারাঠী রিয়াসত দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ঐ গ্রন্থের ইংরাজী বাঙ্গালা বা হিন্দী ভাষান্তর অদ্যাপিও হয় নাই; সুতরাং রামানন্দ বাবু মারাঠীও জানেন। মডার্ণ রিভিয়ুতে তিনি R. C. নামে অধ্যাপক কাননগো প্রণীত সের শাহের সমালোচনা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। এ প্রকার পাণ্ডিত্য এ কালে ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালীর আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার শক্তি ও রাশি রাশি প্রমাণের সদ্ব্যবহারের শক্তি সুবিদিত। বিশেষতঃ তিনি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং যাঁহারা রামানন্দবাবুকে জানেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন

যে, তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলেও তিনি এ কার্য্যের ভার যশের অথবা অর্থের লোভে কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না। মেজর বসু সম্পাদক নির্ব্বাচনে ভুল করেন নাই। সুতরাং এই গ্রন্থে মণি-কাঞ্চণ যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে।

সে কালে এই সাতারার ব্যাপার লইয়া এ দেশে ও বিলাতে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল। সাতারার রাজ্যচ্যুত মহারাজ বিলাতে উকীল পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধিদিগকে পদে পদে বাধা পাইতে হইয়াছে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা জানিতেন যে, সাতারার মহারাজের বিরুদ্ধে কোন বলবান প্রমাণ নাই; তাই তাহারা বারংবার তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই ব্যাপারের আন্দোলন যখন বিলাত পর্য্যন্ত পৌছে, তখন কোম্পানীর তরফ হইতে সাতারা-সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র ছাপা হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের জন্যই তিন খণ্ডে সাতারা সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র, রিপোর্ট প্রভৃতি ছাপা হয়। তাঁহারা সে সকল কাগজ পত্র পড়িয়াছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু এখন এ বহিগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ও দিকে সাতারার মহারাজের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রঙ্গোবাপুজীও কয়েকখানি পুস্তিকায় তাঁহার প্রভুর নালিশ বিলাতের জন-সাধারণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে (Library) আছে। যত দূর মনে পড়ে মডার্ণ রিভিয়ুতে ঘোষণা করা হইয়াছিল, বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অবলম্বনে, অনেক extract-সহ (মডার্ণ রিভিয়ু) আফিস হইতে সাতারার ঘটনা সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। সুতরাং আগ্রহের সহিত গ্রন্থখানির প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

গ্রন্থখানির বিরাট আকার ও মুদ্রণ পরিপাট্য দেখিয়া আশা বাড়িয়া-

ছিল। কিন্তু পাঠ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। পুনরুক্তি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ ঐতিহাসিকের একান্ত বর্জ্জনীয়, তাহা গ্রন্থের প্রতি পত্রে বিদ্যমান। গ্রন্থকার বিশেষ বিবেচনা করিয়াই পুস্তকের নাম রাখিয়াছেন Story of Satara ; কাহিনী ইতিহাস নহে, Story ও History তে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

ঐতিহাসিকের কাহারও পক্ষ অবলম্বন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ সাতারার ব্যাপারে কাহারও গুণ-দোষ অতিরঞ্জন করিবার প্রয়োজন মোটেই নাই। সাতারার প্রতাপ সিংহের নির্দ্দোষিতা এত স্পষ্ট যে, তাঁহার গুণাবলী অযথা অতিরঞ্জিত করিলেও তাঁহার প্রতিপক্ষদিগের দোষ বেশী বাড়াইয়া বলিলে পাঠকের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদয় হইতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ হইতে চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া যে কেতাব ছাপা হইয়াছিল, তাহার একখানি কিছুদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। এই কেতাবের মালিক পূর্ব্বে ছিলেন, কলফিল্ড নামক একজন ইংরাজ। মাঝে মাঝে তিনি পেন্সিলে নানারূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিন। তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় প্রতাপসিংহের পক্ষ সমর্থনের জন্য সমগ্র স্কচ জাতিটাকে গালাগালি দিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সাতারার প্রতাপসিংহের সহিত মিবারের রাণা প্রতাপের তুলনা করা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে একস্থলে ছত্রপতি শিবাজীর সহিত ছত্রপতি প্রতাপের তুলনা করিতেও গ্রন্থকার ও সম্পাদক ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রতাপ সিংহের নির্ব্বাসন নেপোলিয়নের নির্ব্বাসনের সহিত তুলনীয়। রাণা প্রতাপ নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দিনেকের জন্যও তিনি মোগলের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নাই। আর ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ

ইংরাজের দয়াদত্ত সিংহাসনে বসিয়া ইংরাজ পলিটিকাল এজেণ্টের উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। বিলাস-ব্যসন তিনি কখনই পরিহার করেন নাই। শিবাজী নিজ বাহুবলে এক বিরাট রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, আর প্রতাপসিংহ নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডও রক্ষা করিতে পারেন নাই। নেপোলিয়ান্‌কে বন্দী করিতে য়ুরোপের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, আর প্রতাপ সিংহকে ইংরাজ পলিটিক্যাল এজেণ্ট তাঁহারই রাজধানীতে, তাঁহারই প্রাসাদকক্ষে গ্রেপ্তার করিয়া কাশীধামে সামান্য অপরাধীর ন্যায় নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন। আবেদন ও নিবেদন ব্যতীত প্রতাপ সিংহ তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের আর কোন চেষ্টাই করেন নাই। দ্বিতীয় বাজীরাও কুটিল হইতে পারেন, ষড়যন্ত্রকারী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি একবার যুদ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন। আর প্রতাপ সিংহ বিনা যুদ্ধে পূর্ব্ব পুরুষের রাজধানী ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসনে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আর যাহা গুণ থাকুক, রাণা প্রতাপ, শিবাজী ও নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার তুলনা চলে না।

ওভান্স, গ্রাণ্ট প্রভৃতি যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রতাপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্কটলণ্ডবাসী। এইজন্য এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র স্কচজাতিটাকেই গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। স্কচজাতিটা নাকি unimaginative. আমি এ কালের ছাত্র আমার বিদ্যাবুদ্ধি বড়ই কম, ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু রামানন্দবাবু সেকালের একজন বড় পণ্ডিত, তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের "অধঃপতন" হয় নাই। তিনি বহুদিন ধরিয়া ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছেন। শুনিতে পাই, সার ওয়ালষ্টার স্কট নামে একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, রবার্ট বার্ণস নামক একজন বিখ্যাত

কবি, এডাম স্মিথ নামক একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্, ডেভিড হিউম নামক একজন বিখ্যাত দার্শনিক, ষ্টিভেন্সন নামক একজন বিখ্যাত লেখক ঐ স্কটলণ্ডেরই লোক। সুতরাং ওভান্স ও গ্রাণ্টের দোষে কি সমস্ত জাতিটাকে গালি দেওয়া সঙ্গত ? গ্রন্থমধ্যে ওভান্সের নামে যে সব ছড়া লেখা হইয়াছিল, তাহাও উদ্ধৃত করা হইয়াছে, টমসনের একই বক্তৃতা অন্ততঃ চারিবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এমন কি ১২২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এমন কথাও বলা হইয়াছে, যে সার রবার্ট গ্রাণ্ট তাঁহার অপকার্য্যের জন্য ভূত হইয়া দাপুরী নামক স্থানে বেড়াইতেছেন। (If it is any body's ghost, it must be that of Sir Robert Grant, the treacherous Governor of Bombay, who encompassed the ruin of the innocent and virtuous Raja Pratap Singh of Satara. Those who believe in ghosts are of opinion that it is the spirit of evil persons that haunt the place of their death as ghosts) ঐতিহাসিক আলোচনার সময় সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব একেবারেই বর্জ্জনীয়, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত দুইটি প্রসঙ্গ হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে, এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত এই দুইটি দোষে দুষ্ট। উদাহরণ বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। কিন্তু এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। স্কচ্ জাতীয় লোকেরা আর যে অপরাধই করুক না কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহাদের নাম সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে ; কেন না, এল্‌ফিনষ্টোন, আরসকিন ম্যালকলম, গ্রাণ্টডাফ, কানিংহাম প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্কচ্। জীবিত ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যেও মহামতি বেভারিজ স্কটলণ্ডবাসী।

ছত্রপতি প্রতাপসিংহকে মহাত্মা বলা যায় কি না, জানি না, কিন্তু তাঁহার উকীল রঙ্গোবাপুজী যথার্থই মহাত্মা ছিলেন। তিনি প্রভুর কার্য্যে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন, বহু ক্লেশভোগ করিয়া বহুদিন সেই দূর দেশে বাস করিয়াছিলেন। পরে বিদ্রোহের সন্দেহে তাঁহার পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, আর রঙ্গোবাপুজী অজ্ঞাতবাসে পলায়ন করেন। এই মহাপুরুষ এক সুবিখ্যাত বংশের সন্তান। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ রোহিড়খোরের দেশপাণ্ডে শিবাজীর একজন ভক্ত সহকারী ছিলেন। কিন্তু Story of Satara র মতে তিনি শিবাজীর চিটনবীসের বংশধর। রঙ্গোবাপুজীর বংশতালিকা সরদেশাইকৃত মারাঠী রিয়াসতের প্রথমখণ্ডে আছে। এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহিত কি রামানন্দ বাবুর পরিচয় নাই? বোধ হয়, অবসরের অভাবেই তিনি রিয়াসতের পাতা উল্টাইয়া দেখেন নাই, তাই গ্রন্থমধ্যে এত বড় একটা ভুল রহিয়া গিয়াছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা। গ্রন্থকার চিকিৎসক—সম্পাদক ও ঐতিহাসিক নহেন। তাই এই দুই শত পৃষ্ঠার অধিকাংশ সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক কাগজের প্রবন্ধ এবং টমসনের বক্তৃতা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। সমসাময়িক চিঠি পত্র ও দলিল-দস্তাবেজের ন্যায় ঐতিহাসিক হিসাবে সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও বেতনভোগী উকীলের বক্তৃতা মূল্যবান নহে। এমন কি ভোলানাথ চন্দ্র 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে' টমসনের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে, স্থান পায় নাই কেবল যে সকল চিঠি-পত্র ঐতিহাসিকের কাজে আসিতে পারে।

এই পরিশিষ্ট ভাগে সম্পাদক মহাশয় কয়েকটি শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া যে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই

অমার্জ্জনীয়। ডাঃ কডরিংটন সাতারার রাজাদিগের শীলমোহর সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত অসংশোধিত ভাবে কেন মুদ্রিত করা হইল, জানি না। কডরিংটন বিদেশী; তাঁহার ভুল মার্জ্জনীয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধর, বহুভাষাবিদ্ রামানন্দ বাবু যদি সংস্কৃত বাক্যের ভুল অনুবাদ করেন বা ছাপেন, তাহা লজ্জার বিষয় নহে কি? একটি শীলমোহরের সংস্কৃত বাক্য—

শ্রীশম্ভোপাদকমল সেবাভিব্বদয়া বহা,
মুদ্রৈষা শাহুরাজস্য রামসূনোবিরাজতে॥

ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে—Here shines forth the seal of king Ram, the son of Shahu, the seal full of prosperity on account of the glorious Shiva.

আমার সংস্কৃতজ্ঞান অধিক নহে, কিন্তু পাঠকরাই বিচার করুন, 'রামসুনু শাহু'র অনুবাদ 'শাহুপুত্র রাম' নির্ভুল কি না?

মারাঠী চিঠির শেষে লেখনসীমা, মর্য্যাদেয়ং বিরাজতে প্রভৃতি বাক্য লিখিত মোহর থাকে। কডরিংটন এ সকল বাক্যের অনুবাদ যথাযথই করিয়াছেন—তিনি মর্য্যাদেয়ং বিরাজতের অনুবাদ করিয়াছেন—— Here shines forth the limit (৫০৭ পৃঃ)। রামানন্দ বাবু কিন্তু এই অনুবাদ অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"Sri Marajadeyam Virajate" means Let all be done according to these orders. যাঁহারা সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন তাঁহারাই বলিতে পারেন, এই অনুবাদ নির্ভুল কি না।

শিবাজীর শীলমোহরযুক্ত দুই একখানি চিঠি দেখিবার সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই eye-copy অর্থাৎ

চক্ষুতে দেখিয়া অঙ্কিত, যথার্থ প্রতিলিপি নহে। শিবাজী'র মোহরের সংস্কৃত শ্লোকের পাঠোদ্ধার বহুদিন পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। ঐ পাঠ সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ আছে, তাহা আমার জানা ছিল না। রাজবাড়ের গ্রন্থে শ্লোকটি এইরূপ পড়িয়াছি—

প্রতিপচ্চন্দ্রলেখেব বর্দ্ধিষ্ণু বিশ্ববন্দিতা।
শাহাসূনো শিবস্যৈষা মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে॥

এই শ্লোকের অর্থ একপ্রকার বুঝিতে পারি। ভদ্রায় রাজতে, মঙ্গলের নিমিত্ত শোভমান, এইরূপ অনুমান করিয়াছি, কেননা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় আমার তাদৃশ জ্ঞান নাই। রামানন্দ বাবু ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন অন্যরূপ। তাঁহার মতে প্রকৃত পাঠ—

প্রতিপদ চন্দ্রলেখেব বর্দ্ধবিষ্ণু বিশ্ববিদিতা
শাহা সুনো শিব রসৈসা মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে।

তাঁহার মতে ইহার অর্থ—

It means—Like the increase of the new moon from the first day, so all the world obey and worship the seal of Sivaji Raja, the son of Shahaji Raja.

আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। ভারতীয় শব্দসমূহ ইংরাজী অক্ষরে লিখিবার কয়েকটি প্রণালী আছে। রামানন্দ বাবু এই গ্রন্থে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন? কোন্ প্রণালী অনুসারে একই শিবাজী শব্দ এক পৃষ্ঠায় Sivaji ও Sivajee অনুলিখিত হয়? কোন্ প্রণালী অনুসারে রঙ্গোবাপুজী Rungo Bapojeeতে পরিণত হয়? কোন্ প্রণালীতে একই পৃষ্ঠায় মারাঠা Maratha ও Mahratta, রাজা Raja, ও Rajah, রাণী Rani ও Ranee এই

দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে? অন্যের গ্রন্থ সমালোচনাকালে ত রামানন্দ বাবু জেনেভা প্রণালীকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন, এই বানানগুলি কি জেনেভা প্রণালীর অনুমোদিত?

উপসংহারে বক্তব্য যে, এই ভুলগুলি রামানন্দ বাবুর অজ্ঞতার পরিচায়ক, এ কথা বলিবার বা মনে করিবার দুঃসাহস আমার নাই। তিনি প্রবীণ পণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের ন্যায় তাঁহার অবসর প্রচুর নহে। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান মাসিক (The Leading monthly In India) সম্পাদনের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে। তদুপরি আবার বঙ্গদেশীয় একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকেরও তিনি সম্পাদক। এই সকল কাজ করিয়া তাঁহার অবসর, বোধ হয়, অল্পই থাকে। বিরলপ্রাপ্ত অবসরে বিশেষ ব্যস্ততার সহিত, বোধ হয়, তাঁহাকে Story of Satara সম্পাদন করিতে হইয়াছে। তাই তাহাতে এই সকল দোষ-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তিনি যদি গ্রন্থসম্পাদনকালে তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন,যদি গ্রন্থখানা খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়া লইতেন, তাহা হইলে এই সকল ত্রুটি থাকিত না। গ্রন্থকারকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁহার বার্দ্ধক্যের উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি যখন গ্রন্থসম্পাদনের ভার অন্য লোকের হস্তে দিয়াছেন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রকারে দোষমুক্ত হইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী গ্রন্থকার যে প্রবাসী সম্পাদকের হাতেই এই ভার দিয়াছেন, ইহা স্বাভাবিক।

যে কারণেই হউক, বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, এ কালের বাঙ্গালীরা বিদ্যাবুদ্ধিতে—সে কালের বাঙ্গালীদের গৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ। রামানন্দ বাবু এ কালের ছাত্র নহেন। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় সুবর্ণযোগে তিনি প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্পাদিত দশ টাকা মূল্যের গ্রন্থ কিনিয়া কোন অবাঙ্গালী পাঠক নিরাশ হইলে, সে কালের বাঙ্গালীর প্রতিও তাঁহারা আস্থা হারাইবেন; বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কষ্টার্জ্জিত গৌরব আর অক্ষুন্ন থাকিবে না। এইজন্যই গ্রন্থখানির দোষ-ত্রুটি দেখাইতে সাহসী হইয়াছি, নতুবা জনসমাজে প্রতিষ্ঠাবান্ সম্পাদককে হেয় করিবার অসদিচ্ছা আমার নাই; কারণ তাহাতে আমাদের উভয়ের বিশ্ববিদ্যালয়েরই অপ্রতিষ্ঠা হইবে।

শিবাজী ও আফজলখাঁ

মিঃ ভিসেণ্ট, এ, স্মিথ বহুদিন ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসে চাকরী করিয়াছেন। তখন তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সময় তিনি তাঁহার Early History of India সঙ্কলন করেন। তারপর ভারতবর্ষের ললিতকলা সম্বন্ধেও তাঁহার একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হিন্দুযুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতেই তিনি আকবর সম্বন্ধে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। শাসন-সংস্কারের আলোচনাকালেও তিনি নীরব ছিলেন না; ইতিহাসের দিক হইতে তিনি শাসন-সংস্কারের প্রশ্নের যে বিচার করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকেই ভারতের রৌদ্র-দগ্ধ বৃদ্ধ আংলো-ইণ্ডিয়ান সুলভ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তারপর তিনি বিলাতের History পত্রে কয়েকজন উদীয়মান বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে ইঁহারা প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি গোলাপী চশমা পরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। অবশেষে জীবনের সায়াহ্নে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের একখানি আদ্যন্ত ইতিহাস The Oxford History of India রচনা করিয়া অতি অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

পরলোকগত কোন লেখকের রচনার আলোচনা শ্রদ্ধার সহিত না করিতে পারিলে তৎসম্বন্ধে নীরব থাকাই সঙ্গত। সুতরাং এতদিন স্মিথ

সাহেবের এই অভিনব গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য থাকিলেও নীরব ছিলাম। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এত প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে যে একই ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে তাহা আয়ত্ত করা অসম্ভব। সুতরাং স্মিথ-সাহেবের গ্রন্থকেও কোন স্থিরচিত্ত সুধী ব্যক্তি সাধারণ স্কুলপাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা উচ্চস্থান দিবেন এ সন্দেহ আমার ইতিপূর্ব্বে কখনো হয় নাই। দিন কয়েক হইল দেখিলাম একখানি দৈনিকপত্রে রাজা নন্দকুমারের ফাঁসি সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে স্মিথের মত পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনার পর বলিয়াছেন যে নন্দকুমারের ফাঁসিতে কোনপ্রকার বিচার বিভ্রাট ঘটে নাই; অতএব এ সম্বন্ধে অতঃপর আর কাহারও কিছু বলিবার অধিকার রহিল না। এইবার প্রমাণ হইয়া গেল যে নন্দকুমারের ব্যাপারে হেষ্টিংস ও ইম্পের কোনই অপরাধ নাই। এই নন্দকুমারের বিচারের মূল দলিলপত্র বোধ হয় বেভারিজ সাহেব অপেক্ষা কেহই অধিক মনোযোগের সহিত পাঠ করেন নাই। বেভারিজের যুক্তি স্মিথ খণ্ডন করিতে পারেন নাই, সে চেষ্টাও তিনি করেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন যে বেভারিজের লেখা পক্ষ-পাত দুষ্ট। ব্যস্! অতঃপর আর কোন যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নাই। স্মিথের অভিযোগ এই যে বাঙ্গালার নবীন ঐতিহাসিকরা গোলাপী চশমা পরিয়া তাহাদের দেশের অতীতের ইতিহাস নির্ণয় করিতে চাহেন, কিন্তু Oxford History of India পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মিথ সাহেব নিজে ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কালে মসীবর্ণ চশমা পরিধান করিয়া ছিলেন। হয়ত প্রকাশকদিগের চেষ্টায় এবং নাম-মাহাত্ম্যে স্মিথের ইতিহাস ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত হইবে এবং ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণ স্মিথের ফতোয়া বেদ ও কোরাণের

বাক্যের মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। তাই স্মিথ সাহেব যে কি প্রণালীতে ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের জানিয়া রাখা ভাল। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রে স্মিথের গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। স্মিথের গ্রন্থের সকল অংশ সমালোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তিনি মারাঠা ইতিহাস কিরূপে নিজের ইচ্ছামত বিকৃত করিয়াছেন, আমি কেবল তাহাই দেখাইব।

মারাঠী ভাষার সহিত স্মিথ সাহেবের পরিচয় ছিল কি না জানি না। পরিচয় থাকিলেও মারাঠী ভাষায় যে, সহস্র সহস্র ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ আছে তাহার সন্ধান তিনি লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ তিনি নিঃসঙ্কোচে মারাঠা জাতিকে লুটে ডাকাতের জাতি বলিয়াছেন,—যদিও পঞ্চম-বর্ষীয় বালকেরও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, কেবল লুণ্ঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল টিকিতে পারে না। যাক্, এ অভিযোগের উত্তর অন্যত্র দিতেছি। এইখানে স্মিথ সাহেব কিরূপে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য হাজির করিতে জানেন তাহার একটি উদাহরণ দিই।

গ্রাণ্ট ডাফের ইতিহাসে শিবাজী ও আফজলখাঁ ঘটিত ব্যাপারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত মারাঠীতে লিখিত কোন ইতিহাসের ঐক্য নাই। গ্রাণ্ট ডাফ্ এই বিষয়ে খাঁফি খাঁকে অনুসরণ করিয়াছেন। খাঁফি খাঁ শিবাজীর মৃত্যুর বহু পরে তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন—শিবাজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার লেশমাত্রও ছিল না। তিনি শিবাজীকে কুকুর ও কুকুরের বাচ্ছা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই এবং শিবাজীর মৃত্যু-তারিখ-সূচক যে বাক্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহার অর্থ কাফের জাহান্নমে

গিয়াছে। সুতরাং শিবাজীর প্রতি তিনি সুবিচার করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। আফজলখাঁর হত্যা ব্যাপারের সঠিক সংবাদ জানিবার উপায় তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। তিনি শিবাজীর রাজত্বের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে স্থানে স্থানে বহু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়াছে, বোধ হয় অনেক সময় দিল্লীর বাজার-গুজব শুনিয়াই তিনি এই কাফের সয়তানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। গ্রাণ্ট-ডাফ আফজল খাঁর বিবরণে সেই চিত্রের প্রতিলিপি দিয়ছিলেন মাত্র।

মারাঠা ঐতিহাসিকেরা প্রথম হইতেই গ্রাণ্ট ডাফের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। সে প্রতিবাদের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বোধ হয় এদেশে অবস্থান-কালে বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলার আরাম কেদারায় স্মিথ সাহেবের কর্ণে পৌছায় নাই। কিন্তু তাঁহার'আকবর' নামক গ্রন্থে তিনি পারসী ঐতিহাসিক কারকারিয়ার একটি রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; সুতরাং কারকারিয়ার রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এমন অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই কারকারিয়াই তাহার একখানি ইংরাজী পুস্তিকায় শিবাজীর কলঙ্ক-ক্ষালনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে সংবাদ স্মিথ সাহেবের জানা ছিল কিনা তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

যাহা তাঁহার জানা ছিল, তাহা হইতে তিনি শিবাজী কর্ত্তৃক আফজল খাঁর হত্যার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন—

An imposing army numbering about ten thousand men and equipped with mountain guns, was organised and despatched under the command of Afzal Khan, a brave and experienced officer. Sivaji

not being capable of meeting his foe in the field, opened negotiations, and a Brahman envoy was sent by the Musalman general to his adversary. The envoy played the traitor, permitting his sympathies as a Hindu to outweigh his duty to his master. The Brahman and Sivaji so arranged a plot to inveigle Afzal Khan into an interview at which he could be killed with little risk to the Maratha. Afzal Khan fell into the trap readily and accompanied only by a single Sayyid officer, advanced close to Partabgarh and met Sivaji, who also had but one companion Tanaji Malesri. The Maratha professed the most abject submission and threw himself weeping at the general's feet. When Afzal Khan stooped to raise him in the customary manner, Sivaji wounded him in the belly with a horrid weapon called tiger's claw, which he held hidden in his left hand, and followed up the blow by a stab from a dagger concealed in his sleeve. The treacherous attack succeeded perfectly and the Marathas ambushed in the surrounding jungles destroyed Afzal Khan's army.

স্মিথ সাহেব যদি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের পর ইহাই সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তবে তাঁহার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ জন্মাইতে পারে

সত্য, কিন্তু তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তিনি পাদটীকায় লিখিতেছেন—

"For the details I follow Manker, The Life and Exploits of Sivaji (2nd Ed. Bombay, 1886) a valuable little book, now almost unprocurable" অপর একস্থানে তিনি বলিতেছেন :—the little from a lost manuscript, is of considerable value. It is entitled The Life and Exploits of Sivaji and has become very scarce."

মানকরের গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য সন্দেহ নাই। দুই বৎসর যাবত চেষ্টা করিয়াও আমি এখনও পর্য্যন্ত উহার এক খণ্ড নিজের জন্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুগ্রহে দুই বৎসর পূর্ব্বে মানকরের গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি স্কটল্যাণ্ড হইতে ঐ গ্রন্থের এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি তখন শিবাজীর প্রাচীনতম মারাঠী জীবন-চরিত সভাসদ বখরের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলাম, মানকর সভাসদের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন, সুতরাং অধ্যাপক সরকার মহাশয় আমাকে ঐ গ্রন্থখানি দেখিতে দিয়াছিলেন। স্মিথ সাহেব বলিতেছেন যে মানকর যে হস্তলিখিত পুঁথি হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা হারাইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। মানকরের ব্যবহৃত পুঁথির বয়স কত তাহা জানা যায় নাই। ঐ পুঁথি যে হারাইয়া গিয়াছে সে সংবাদই বা স্মিথ সাহেব কোথায় পাইলেন? আর যদি হারাইয়াই গিয়া থাকে তাহা হইলেই বা মানকরের অনুবাদের মূল্য কি করিয়া বাড়িল? মানকর যে গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার বহু হস্তলিখিত অনুলিপি মহারাষ্ট্রে পাওয়া

যায়। আমি অনায়াসে উহার ১০।১২ খানি নূতন ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। স্মিথ সাহেবের নিজের দেশেই ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে সভাসদ বখরের একখানি হস্তলিখিত প্রতিলিপি রহিয়াছে। এবং মানকরের গ্রন্থ যে ঐ বখরেরই অনুবাদমাত্র, তাহা ব্লুমহার্ড সঙ্কলিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের মারাঠী হস্তলিখিত পুঁথির তালিকার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া গেলেই স্মিথ সাহেব জানিতে পারিতেন। সকলেই জানেন যে প্রাচীন গ্রন্থের মাত্র একখানি পুঁথির উপর নির্ভর করা চলে না। মানকর একখানি মাত্র পুঁথি পাইয়া তাহাই অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবার তাহার অনুবাদও সর্ব্বত্র মূলানুগত হয় নাই। অনেক দিন হইল রাও বাহাদুর কাশিনাথ নারায়ণ সানে অনেক পুঁথি মিলাইয়া বিভিন্ন পাঠান্তর দিয়া অনেক টীকা-টিপ্পনী সহ সভাসদ বখরের একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন পরে প্রায় ৪০ বৎসরের পুরাতন মানকর ও এক শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত গ্রাণ্ট্-ডাফের দোহাই দেওয়া পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে।

কিন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞতাই স্মিথ সাহেবের একমাত্র অপরাধ নহে। তিনি বলিয়াছেন যে আজফলখাঁর হত্যার যে বিবরণ তিনি তাঁহার তথাকথিত ইতিহাসে প্রদান করিয়াছেন তাহা মানকরের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এই কথাটি একেবারে মিথ্যা! মানকরের গ্রন্থ এখন আমার নিকট নাই।*

*এতদিন পরে মানকরের Life and Exploits of Shivaji একখণ্ড পাইয়াছি। স্মিথ সাহেব তদ্দ্বারা পুস্তকের ১৮৮৬ সালের প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানিও ঐ বৎসরের ঐ সংস্করণের বই। এই পুস্তকে বিতর্কিত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ—The king, who was then at the foot of the hill, advanced slowly to the pavilion but halted on learning

তাহার নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা আমার বেশ মনে আছে যে আফজলখাঁর বিবরণে সানের সম্পাদিত মূল বখরের সহিত মানকরের অনুবাদের কোন অনৈক্য নাই। সমস্ত মারাঠী ঐতিহাসিকই বলিয়াছেন আফজল খাঁই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীকে

that the Khan was accompanied by a very expert swordsman by name Sayad Banda, and sent for Pantajipant. On his arrival the king said "I have the same reverence for the Khan that I have for father Shahaji ; arrange things in such a way, that I may not feel alarmed in his presence. I am afraid of Sayad Banda who is with the Khan ; see that he is removed to a distance." Pantajipant then went to the Khan and caused Sayad Banda to be sent away. The Khan was then left with only two followers. The king then proceeded with two followers Jiwba Mahali and Sambhaji Kahuji. The Khan also advanced a few paces to receive him ; and while embracing each other, the Khan pressed the king's head under his armpit, and having unsheathed his sword, thrust it into the sides of the king, who received no hurt, as it only clashed against the chained steel armour in which he was derssed. The king thereupon plunged his "Wagnakh" into the bowels of the Khan who wore only a robe, and pulled them out. He next used his Vinchu. Having thus inflicted two wounds the king disentangled his neck from the Khan's armpit, leaped down from the platform and left the scene. The

প্রথম আক্রমণ করিয়াছিলেন, শিবাজী আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতি-আক্রমণ করিয়াছিলেন মাত্র। একখানি মারাঠী কবিতা গ্রন্থে লিখিত আছে যে আফজলখাঁ যখন শিবাজীর কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া তাঁহার শ্বাস রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন সেই আসন্নকালে বিপন্ন মারাঠা বীর গুরু রামদাসের নাম স্মরণ করিয়াছিলেন। জানি না স্মিথ সাহেব যে বিবরণ গ্রাণ্টডাফ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা মানকরের ঘাড়ে

Khan then raised a cry "Help, help, murder, murder, treachery, treachery." Hearing this, the palanquin-bearers rushed forward and putting him into the palanquin bore him away. But while they were moving with the palanquin, Sambhaji Cowji Mahaldar wounded the palanquin bearers in their legs and brought the palanquin down to the grounds. He then cut off the Khan's head and brought it to the king. Sayad Banda then hastened to the scene and showered his sword blows upon the king. The king took his own sword from Jiwba Mahali and while engaged in fencing, averted four blows of Sayad Banda by means of his sword and Vinchu. Sayad Banda was then on the point of inflicting a wound on the king's hand when Jiwba by means of his sword which he had about him, cut the arm of Sayad Banda clean off at the shoulder. This done, Jiwaji Mahali, Sambhaji Kahuji Mahaldar and the king went to the fort with the khan's head, and when there, they fired a gun.

এই বিবরণের সহিত স্মিথ সাহেবের বিবরণের কোনই ঐক্য নাই।

চাপাইয়া দিলেন কেন ? ইহা কি তাঁহার বার্দ্ধক্যজনিত স্মৃতি-বিভ্রমের ফল ? অথবা মারাঠা জাতির প্রতি বিদ্বেষের আতিশয্যে এই বৃদ্ধ আংগ্লো ইণ্ডিয়ান ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার পাঠকবর্গকে এমন একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া প্রতারিত করিতে চাহিয়াছেন, যাহা তাহাদের সহজে পাইবার উপায় নাই। কে বলিবে, তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি !

কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার ভ্রম সংশোধনের সুযোগ জুটিয়াছিল। বিলাতের History পত্রে তিনি কিনকেইড ও পারসনীস রচিত মারাঠা ইতিহাসের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, আফজলখাঁ সম্বন্ধীয় ঘটনার একটি নির্ভুল বিবরণ উহাতে আছে। স্মিথ গ্রন্থকারদ্বয়কে গালি দিয়াছেন—সে তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা। অজ্ঞতা গোপন করিবার উহাই প্রকৃষ্টতম পন্থা। কিন্তু ইহার পরও তিনি নিজের ভ্রম স্বীকারের দ্বিতীয় সুযোগ পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের শিবাজী তাঁহার হস্তগত হইয়া ছিল ; এই গ্রন্থখানি তিনি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি অধ্যাপক যদুনাথের গ্রন্থের প্রভূত প্রশংসাও করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা এদেশে পৌছিয়াছে তাঁহার মৃত্যুর পরে। মৃত্যুর ওপার হইতে স্মিথ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে অধ্যাপক সরকার যখন মারাঠী অপেক্ষা ইংরাজী ঐতিহাসিক উপাদানেরই অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন তখন আফজল-ঘটিত ব্যাপারে তিনি মারাঠা বখরকারের অনুসরণ করিলেন কেন ? এইখানে স্মিথ সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছেন। অধ্যাপক সরকার বিশেষ করিয়া সমসাময়িক চিঠিপত্র ও সমসাময়িক ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াছেন,একদিকে তিনি যেমন শিবাজী-প্রতাপ ও শেডগাঁওকর বখর প্রভৃতি মারাঠা বখরকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া

অগ্রাহ্য করিয়াছেন সেইরূপ তিনি ইটালীয়ান লেখক মেনুসী ও সুবিখ্যাত ইংরেজ লেখক অর্মের সাক্ষ্যেও সবিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস রচয়িতা বিলাতের রয়াল হিষ্টীয়োগ্রাফার ব্রুস সাহেবের নাম করাও তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ফরাসী লেখক মিশো তাহার মহীশূরের ইতিহাসে শিবাজীর দিল্লী হইতে পলায়নের যে অদ্ভুত উপন্যাস প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই বা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ঐতিহাসিক আস্থা স্থাপন করিবেন? আর পর্তুগীজ লেখক গার্ডার শিবাজীর জীবন-চরিতের ত কথাই নাই। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপক সরকার আফজল খাঁর ব্যাপারে কেবল মারাঠা বখরকারগণকে অনুসরণ করেন নাই। তিনি স্মিথ সাহেবের মত মারাঠা জাতিকে ও শিবাজীকে গালাগালি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি যেখানে ন্যায় বুঝিয়াছেন শিবাজীর কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন, আবার যেখানে অন্যায় বুঝিয়াছেন সেখানে নির্ভীকভাবে শিবাজীর দোষ ত্রুটি প্রদর্শনে ইতস্ততঃ করেন নাই। এজন্য মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা তাঁহার গ্রন্থের প্রতিকুল সমালোচনা করিয়াছে। স্মিথ সাহেব যদুনাথের শিবাজীর ৬৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইতেন যে রাজাপুরের ইংরাজ বণিকেরাও জানিতেন যে শিবাজীকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক প্রতারণা করিবার দুষ্ট অভিসন্ধি আফজলের প্রথম হইতেই ছিল। রাজাপুরের ইংরেজেরা মুসলমান রাজ্যে বাস করিতেন, সুতরাং মুসলমান সেনাপতির প্রকৃত অভিসন্ধি জানিবার সুযোগ তাহাদের ছিল; তাঁহারা সুরাটের কাউন্সিলে লিখিয়াছিলেন—

Against Shivaji the queen this year sent Abdullah Khan with an army of 10,000 horse and foot, and because she knew with that strength he was not able to

resist Shivaji, she counselled him to pretend friendship with his enemy, which he did. And the other [i. e, Shivaji] whether through intelligence or suspicion, it is not known, dissembled his love toward him etc. (Factors at Rajapur to Council at Surat 10th Oct. 1659 T. R. Rajapur) এই সমসাময়িক ইংরাজী পত্র সভাসদের মারাঠী বিবরণেরই সমর্থন করিতেছে।

সভাসদ বলেন, আফজলখাঁই শিবাজীকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীর দূত পন্তাজী গোপীনাথ চতুরতা পূর্ব্বক মুসলমান সেনাপতির প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রভুকে সতর্ক করিয়া দেন। শিবাজী ও আফজলের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন উভয়ের সহিতই মাত্র দুইজন করিয়া অনুচর ছিল। শিবাজীর সহিত ছিলেন সাম্ভাজী কাবজী মহালদার ও জিউ মহালা, তানাজী মালুসরা নহে। এবং আফজলের সহিত কোন সৈয়দ কর্ম্মচারী ছিলেন না। শিবাজীর আপত্তিতে আফজল সৈয়দ বন্দাকে দূরে রাখিয়া আসেন। আফজল শিবাজী অপেক্ষা বলবান ও দীর্ঘায়তন। শিবাজীকে আলিঙ্গনচ্ছলে তিনি বাম কুক্ষিতলে চাপিয়া ধরিয়া যমধার ও তরবারির আঘাত করেন। শিবাজীর শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু তরবারির আঘাত তাঁহার লৌহবর্ম্মে প্রতিহত হইয়াছিল। তার পর তিনি বাঘনখের দ্বারা আফজলকে আহত করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। প্রতারণার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তাই তাঁহার সংকেত মত তাঁহার সৈন্যবর্গ মুসলমান সেনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। মানকরও এই বিবরণই দিয়াছেন।

এখন দেখিতে হইবে কোন বিবরণ বেশী সম্ভব। খাফি খাঁর, কি সভাসদের? ইংরাজ কুঠির পত্রে প্রকাশ আফজলের সঙ্গে মাত্র ১০,০০০ সেনা ছিল। শিবাজী সেই সময় প্রায় ২০,০০০ অশ্বারোহী সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতাপগড়ের দুর্গ অতি দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। এইরূপ গিরিসঙ্কুল আরণ্য ভূমিতে সুবিশাল সেনা লইয়া শিবাজীকে পরাজিত করা কত কঠিন তাহা বিজাপুরের সেনাপতি বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন, কারণ তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বাইর সুবেদার ছিলেন। আফজল শিবাজী অপেক্ষা দীর্ঘায়তন ও সমধিক বলশালী; সুতরাং একাকী মল্লযুদ্ধে খর্ব্বকায় মারাঠা বিদ্রোহীকে অনায়াসে পরাজিত করিবার আশা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। এক খাফি খাঁ ভিন্ন আর কেহই এ ঘটনার সংস্রবে শিবাজীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। পক্ষান্তরে সভাসদের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কারণ জাবলী বিজয়ের বিবরণে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে শিবাজী কৌশলে চন্দ্রারাওকে প্রতারিত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রভুর দোষ গোপনের চেষ্টা করেন নাই। হয় ত সেই অরাজকতার দিনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে হত্যা করা কেহ দোষেরও মনে করিতেন না। সেই সভাসদই আফজল খাঁর ব্যাপারে প্রথম আক্রমণের দুরভিসন্ধি ও চেষ্টা মুসলমান সেনানীর উপর আরোপ করিয়াছেন কেন? ইহার অন্য কোন সদুত্তর নাই। আফজল খাঁর হত্যার ব্যাপারে শিবাজী নির্দ্দোষ, তিনি আফজলকে হত্যা করিয়াছিলেন আত্ম রক্ষার চেষ্টায়। সুতরাং ইংরাজী murder শব্দ এখানে প্রযোজ্য নহে।

ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য সত্য-নির্ণয়। কাহারও প্রতি অযথা পক্ষপাত অথবা অযথা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা অপেক্ষা

গুরুতর অপরাধ ঐতিহাসিকের পক্ষে আর কিছুই নাই। স্মিথ সাহেবের অপরাধ এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি হয় মানকর পাঠ না করিয়াই তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা জানিয়া শুনিয়া আপনার পাঠক-বর্গকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্রদিগকে প্রতারণার চেষ্টা করিয়াছেন।

পেশবার শিকারখানা

কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ লিখিয়া গিয়াছেন, শিবাজীর অষ্টাদশ কারখানার মধ্যে একটির নাম শিকারখানা। কেবল মাত্র নাম হইতে ইহার স্বরূপ বুঝা যায় না, কিন্তু পেশব্যাঞ্চী বখরের গ্রন্থকার কৃষ্ণাজী বিনায়ক সোহানী পেশবার শিকার খানার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেকালের শিকার-খানাটা ছিল কতকটা একালের চিড়িয়াখানার বা পশুশালার অনুরূপ। সোহানীর গ্রন্থে আছে যে, পেশবার শিকার খানায় ছিল, মানুষের কথার অনুকরণ দক্ষ সাত আটটি বাঙ্গালা দেশের ময়না, গোটাকতক টিয়া, ঝুঁটিওয়ালা ভরত পক্ষী বা 'চন্দ্রোল' গোটাকয়েক হাঁস, পানকৌড়ি আর পাঁচদশ জোড়া ময়ুর। পাখীর তালিকা এইখানেই শেষ; কৃষ্ণসার ও হরিণী মিলিয়া মৃগ ছিল প্রায় দুই শত, কালো, হলদে ও রঙ-বেরঙের শশক ছিল পাঁচ সাত শত। পার্ব্বতীর পথের ধারে বাগানের মধ্যে একটি পুকুরের পাড়ে গৃহ রচনা করিয়া শশকগুলি রাখা হইয়াছিল। শিকারী জন্তুর ও অসদ্ভাব ছিল না, দুই চারিটি চিতা, দশ বিশটা বাঘ পার্ব্বতীতে বড় বড় ঘরের মধ্যে মোটা লোহার শিকল দিয়া বাঁধা হইয়াছিল। ঘরগুলি চারিদিক খোলা। আর সেখানে ছিল ছোট খাটো একটা ঘোড়ার মত উচ্চ, একেবারে হরিদ্রা বর্ণের একটা ভয়ানক বাঘ, তাহার নাম সম্ভু বাঘ। কালরঙ্গের চিহ্ন নাই, এমন বাঘ আজকাল সচরাচর দেখা যায় না। সুতারাং পেশবার পশুশালার এই একটা জানোয়ার যে

বাস্তবিকই দর্শনীয় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে গণ্ডার পাওয়া যায় না। ইংরাজ শিকারীর রাইফেলের গুলিতে হিন্দুস্থানের গণ্ডারের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে কিন্তু হিমালয়ের নিকটস্থ জঙ্গলে এক সময় অনেক গণ্ডার ছিল। মহাদজী সিন্ধিয়া পেশবার শিকার খানার জন্য হিন্দুস্থান হইতে গোটা কয়েক গণ্ডার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কয়টা পাঠাইয়া ছিলেন, সোহানী তাহা লেখেন নাই। এতগুলি জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পক্ষী, হরিণ, শশক, ব্যাঘ্র ও গণ্ডারের পরিচর্য্যার নিমিত্ত বহু-সংখ্যক লোক নিযুক্ত ছিল। মাঝে মাঝে পেশবার দিগ্বিজয়ী সেনা-নায়কগণ দেশে ফিরিবার সময় উপহার দিবার জন্য বিজিত দেশ হইতে নানা-বিধ পশু পক্ষী লইয়া আসিতেন। এইভাবে পার্ব্বতী শৈলের জীবনিবাসের অধিকাংশ সংখ্যা বৃদ্ধি হইত, পেশবার শিকার খানারও বাহার বাড়িত।

শিবাজীর শিকার খানার কি কি জানোয়ার ছিল তাহা এতদিন পরে বলিবার উপায় নাই। মারাঠী গ্রন্থে তাঁহার জীবনিবাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইংরেজ লেখকগণ ইহার খবর অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পেশবার শিকার খানাটাও বোধ হয় ঐরকম একটা কিছু ছিল। যাঁহারা আবুল ফজলের অমর গ্রন্থের সহিত কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিচিত, তাঁহারাই জানেন যে দিল্লীশ্বর আকবর চিতা পুষিতেন, বাঘ পুষিতেন, শিকারী বাজ পুষিতেন, অনেক জানোয়ার তাঁহার জীবনিবাসে ছিল। হরিণ প্রভৃতি সুন্দর পশুরত কথাই নাই। এই সকল জানোয়ারের জন্য বাদশাহের ভাণ্ডার হইতে অনেক টাকা খরচ হইত। আবার মিরশিকার পদবীধারী তাঁহার একজন কর্ম্মচারী ছিল। বাদশাহ হাতীর লড়াই, হরিণের লড়াই দেখিতে ভাল-বাসিতেন, শিকারী বাজ, শিকারী চিতা লইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন,

সেই সকলের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতেন মিরশিকার। আগের ও পরের, বাদশাহের ও পেশবার পশুশালার প্রকৃতি আলোচনা করিলে মনে হয়, বাক্‌পটু ময়না ও টিয়া না থাকুক, মনোহর হরিণ ও হরিণী না থাকুক, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত ও চিত্র-বিচিত্র শত শত শশক না থাকুক, দাক্ষিণাত্যে সুদুর্ল্লভ গণ্ডার না থাকুক, শিবাজীর বোধ হয় দুই একটা শিকারী বাজ ও শিকারী চিতা ছিল। অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে মৃগয়া করিবার অবসর তাঁহার হইত কিনা, জানি না; বোধ হয় হইত না। কিন্তু মুকুটধারী নরপতি দিগকে সুদ্ধ সম্ভ্রমের জন্য অনেক ঠাট বাজায় রাখিতে হয়। সে কালের রাজা বাদশাহেরা অবসরকালে শিকার করিতেন, জানোয়ারের লড়াই দেখিতেন। তাই শিবাজীও বোধ হয়, মুঘল বাদশাহের অনুকরণে একটা শিকারখানা গড়িয়াছিলেন, দুই দশটা চিড়িয়া ও জানোয়ার সংগ্রহ করিয়াছিলেন! আর সেই হইতেই মহারাষ্ট্রে শিকারখানার ফ্যাশন পেশবা যুগের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল।

সোহানীর গ্রন্থে পেশবার পশুশালার সকল জীবের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও বাসগৃহের অবস্থা সম্বন্ধে সোহানী কিছুই বলেন নাই। তিনি কেবল পশুশালার গুটিকয়েক পশুপক্ষীর নাম করিয়াছেন, সংখ্যার বেলায় দশ বিশ, শ' দুইশ', পাঁচ সাত প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া করিয়াছেন। জীব নিবাসের জন্য অনেকগুলি চাকর রাখিবার কথায় উল্লেখ করিয়াছেন, আর কিছু বলেন নাই। কিন্তু কয়েকজন ইংরাজ লেখকের গ্রন্থে পেশবার শিকারখানার সংবাদ আরও একটু পাওয়া যায়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে মহীশূরের শার্দ্দুল টিপু সুলতানের সহিত যখন ইংরাজ সরকারের যুদ্ধ হয় তখন পেশবা ও নিজাম টিপুর বিরুদ্ধে ইংরাজের সঙ্গে যোগদান

করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে মারাঠাদিগের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন পরশরাম ভাউ পটবর্দ্ধন, এবং পটবর্দ্ধনের সাহায্য করিতে ইংরাজ পক্ষ হইতে কাপ্তেন লিটল ছোট একটা পল্টন লইয়া আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁহারা পুনার পথে যান নাই। তাই পেশবার রাজধানী দেখিবার সুযোগ ও অবসর তখন তাঁহাদের হয় নাই। ফিরিবার পথে তাঁহারা পুনায় আসিয়া কিছুদিন ইংরাজ দূত সার চার্লস ম্যালেটের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহারা পুনা নগরের যাবতীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া গিয়াছিলেন। পেশবার শিকারখানাও বাদ যায় নাই। কাপ্তেন লিটলের অভিযানের বিবরণ তাঁহারই একজন সহকারী, লেপ্টেনাণ্ট মুর, লিখিয়া গিয়াছেন। মুরের গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ; সুতরাং বহিখানা এখন বাস্তবিকই দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থে পেশবার শিকারখানার অতিক্ষুদ্র বিবরণ আছে।

মুর লিখিয়াছেন :—

"The Peshwa has a menagerie of wild animals, but it is not a large, nor a very select collection. It consists of a rhinoceros, a lion, several royal tigers, leopards, panthers and other animals of the cat kind. An extraordinery camel is by far the most curious creature in the collection : it is of that species, called, we believe, the Bactrian camel and has two humps of such unweildy dimensions, that when lying down it cannot easily rise, from their enormous weight. It is quite white, with very long nair, a characteristic

of its species, about its head and neck. The animal is of course a lufas natura.

It was, as well as the rhinoceros, we learned, a present from Scindia. The lynx is a delicate animal, called in India and Persia, from its black ears sceahgosh, Sir Charles Malet has all these animals, with others, representet in clay by a Brahmin, who has great merit in his modellings , the placid serenity of the camel and the ferocious confidence of the tiger, he is happy in hitting.'

অর্থাৎ পেশবার একটি পশুনিবাস আছে, কিন্তু তাহার জীব সংগ্রহ তেমন বড় নয়, ভালও নয়। এই পশুশালায় একটা গণ্ডার, একটা সিংহ, গোটাকয়েক বড় বাঘ (Royal Bengal Tiger), চিতা, গুলবাঘ ও বিড়ালবর্গের অন্যান্য জানোয়ার আছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য জন্তু একটা উট। আমার বিশ্বাস, যাহাকে বক্ত্রীয়-উট বলে, এইটি সেই জাতীয় , পিঠের উপর মস্ত বড় ও বেজায় ভারী দুইটা কুঁজ, শুইলে সেই কুঁজের ভারে উটটা আর সহজে দাঁড়াইতে পারে না। পশুটির গায়ের রং একেবারে শাদা, মাথার ও গলার ধারে লম্বা লম্বা লোম, -- যেমন এই জাতীয় উটের থাকে। জন্তুটার বৈজ্ঞানিক নাম অবশ্য লুফাস নেটুরা। আমরা শুনিলাম যে, এই উট আর গণ্ডারটা সিন্ধিয়ার উপহার। লিঙ্কস্ জানোয়ারটা ক্ষীণকায় ; ইহার কানের রং কালো বলিয়া ভারতবর্ষে ও পারশ্যে ইহাকে সিয়াগোস (কাল কান) বলে। সার চার্লস ম্যালেট এই সকল জানোয়ারের মাটির মূর্ত্তি একজন মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-নিপুণ ব্রাহ্মণ-শিল্পীর

দ্বারা তৈয়ারী করাইয়াছেন। উটের প্রশান্ত গম্ভীর ভাব আঁর বাঘের হিংস্র আত্মপ্রত্যয়ের ভাবটি বেশ সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে।

সোহনী সিংহের নাম করেন নাই, সেটা বোধহয় তাঁহার গ্রন্থ রচনার পরে আমদানী হইয়াছিল। আর সেই একরঙ্গের হল্‌দে বাঘটা লেপ্টেনাণ্ট মুর দেখিতে পান নাই, দেখিলে অমন আশ্চর্য্য জানোয়ারের কথা নিশ্চয়ই লিখিয়া যাইতেন। সোহনী বলেন, সিন্ধিয়া পেশবার শিকারখানায় গোটাকয়েক গণ্ডার পাঠাইয়াছিলেন; মুর দেখিয়াছিলেন কেবল একটা গণ্ডার। বাকী গণ্ডারগুলি আর শম্ভু বাঘ, বোধহয় মুরের পুনায় আগমনের পূর্ব্বেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

সার চার্লস ম্যালেটের নিকট পুনার সেই ব্রাহ্মণ শিল্পীর নির্ম্মিত বাঘ, সিংহ, হাতী, শশক, গণ্ডার প্রভৃতি ছোট বড় যে সকল জানোয়ারের মৃন্ময় মূর্ত্তি ছিল সেই গুলিকে একজায়গায় সাজাইয়া, মাঝখানে ম্যালেটকে দাঁড়-করাইয়া একজন ইংরাজ চিত্রকর, বোধহয় ওয়েলস্, একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। রাওবাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস তাঁহার সদ্য প্রকাশিত Poona in Bygone Days বা অতীতকালের পুণা নামক গ্রন্থে এই চিত্রের একখানি সুন্দর প্রতিলিপি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

লেপ্টেনাণ্ট মুর পেশবার শিকারখানা দেখিয়া খুসী হইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি যাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন সেই চার্লস ম্যালেটের এই জীব নিবাসটি বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি কয়েকটি পশু ও পাখী এই চিড়িয়াখানায় উপহার দিয়াছিলেন। ম্যালেটের আর একজন ইংরাজ অতিথি কিন্তু পেশবার শিকার খানার খুব তারিফ করিয়াছেন। তিনিও মুরের ন্যায় যুদ্ধ ব্যবসায়ী, তাঁহার নাম মেজর প্রাইস। তিনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে পুণায় গিয়াছিলেন। মেজর প্রাইসের মূল গ্রন্থ আমি দেখি নাই,

রাওবাহাদুর' পারসনীসের পুস্তক হইতে প্রাইসের মন্তব্যের সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন :—

পার্ব্বতী শৈল মূলে অবস্থিত পেশবার পশুশালা কতিপয় বন্ধুর সহিত দেখিতে গিয়াছিলাম। এই স্থান দেখিয়া মনোভাব যেরূপ হইয়াছিল, পুনায় অবস্থিতি কালে আর কিছু দেখিয়া সেরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়েনা। এই পশুশালায় তখন গুটিকয়েক চমৎকার জানোয়ার ছিল, আমি উহা অপেক্ষা সুন্দর জানোয়ার দেখি নাই। একটা সিংহ ও একটা গণ্ডারের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক সৌন্দর্য্য বোধহয় তাহাদের অরণ্যবাসেও ইহা অপেক্ষা ভাল হইতে পারিতনা। জঙ্গলের মালিক জানোয়ারের রাজার চেহারাটি তাহার পদমর্য্যাদার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাহার দেহটি মাংসল, শরীর সুপরিচ্ছন্ন, ললাট প্রশস্ত ও বৃহৎ, দেখিলেই মনে হয়—শক্তির ও মহিমার একটি জীবন্ত ছবি, সমগ্র প্রাকৃতিক জগতে ইহার তুলনা নাই। সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ নহে, একটি খোলা চালার নীচে মৃত্তিকায় প্রোথিত দণ্ডের সহিত লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

চারি দিকেই খোলা, তাই খাঁচার ভিতর রাখিলে যেমন দুর্গন্ধ হয়, এখানে তাহা হয় নাই। পশ্চাতের পদদ্বয়ে দেহভার ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট এই বিরাট পশু তাহার বিশাল বক্ষ ও সম্মুখের বাহু আমাদিগের দিকে প্রসারিত করিয়া এমন নিরুদ্বিগ্ন ঔদাসীন্যের সহিত তাহার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিচ্ছদ-পরিহিত নবাগত শ্বেত দর্শকদিগকে দেখিতেছিল যে, আমাদের মনে সত্য-সত্যই ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল।

"সিংহের নিকটে তাহারই মত খোলা ঘরে, তাহারই মত লোহার

শিকলে বাঁধা একটা গণ্ডার। এমন চমৎকার গণ্ডার ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও আমি দেখি নাই। আলগা চামড়ার বিরাট ভাঁজে ভাঁজে ঢাকা কিম্ভূত কিমাকার যে সকল জানোয়ার সচরাচর দেখান হয়—এ গণ্ডারটা মোটেই সে রকম নয়। এই বিরাট পশুর সুপরিপুষ্ট দেহের বর্ম্মের মত বহিরাবরণ যেন ভিতরের মাংসের চাপে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। জানোয়ারটা মদের পিপার মত গোলগাল কিন্তু ছোট একটা শূকরের ছানার মতই চঞ্চল। রক্ষকের লাঠির মৃদু স্পর্শের ইঙ্গিতে যখন গণ্ডার পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া একেবারে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তখন ইহার তৎপরতা আমাকে বাস্তবিকই বিস্মিত করিয়াছিল। তখন সরুদিকের-উপর-খাড়াকরা একটা মদের পিপার সহিত এই গণ্ডারের উপমা না দিয়া থাকিতে পারি নাই। যাহাই হউক, এই বিশালাকায় পশুর ক্ষিপ্রতা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। ইহার ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি যেন জীবনের প্রেরণায় পরিপূর্ণ। ঠোঁটের উপরের খড়্গ তখনও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু বক্রাগ্র দেখিলেই বুঝা যায়, ঐ বিরাট দেহের সম্পূর্ণ বল দিয়া আঘাত করিলে তাহার ফল কি ভয়ানক হয়। তখন গণ্ডারের নিকট মহাবল হস্তীর পরাভবের যে কাহিনী শুনা যায় তাহাতে আর অপ্রত্যয় হয় না। এই লাইনেই গোটাকয়েক বাঘ ও অন্যান্য জানোয়ার ছিল; কিন্তু ইহাদের তুলনায় তাহারা দর্শনের অযোগ্য, ইহাদের পার্শ্বে তাহাদিগকে নগন্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।”

প্রাইসের এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, পেশবার পশুশালায় রক্ষিত সিংহ ও গণ্ডারটির স্বাস্থ্য অব্যাহত ছিল। জীবনিবাসের রক্ষকদিগের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। কারণ, বন্দী শ্বাপদের

স্বাস্থ্যহানি সামান্য অযত্নেই হইতে পারে। প্রাইসের বিবরণ হইতে আরও জানা যাইতেছে, জীবনিবাসের গৃহগুলি সুপরিচ্ছন্ন ছিল ; কারণ, সিংহের ঘরেও তিনি ওক্কার জনক দুর্গন্ধ পান নাই। আর, বোধহয়, পশুপালনকারীগণ তাহাদের রক্ষিত জন্তুগুলিকে ভাল বাসিত, আদর করিত ; তাহা না হইলে রক্ষকের লাঠির মৃদুস্পর্শে গণ্ডার ঠিক সার্কাসের গণ্ডারের মত দুই পা তুলিয়া দাঁড়াইবে কেন ?

সিংহ, বাঘ, চিতা প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলি লোহার শিকলে বাঁধা থাকিত, কিন্তু নিরীহ হরিণ-হরিণীদিগকে বাঁধিয়া রাখিবার বা লোহার তারের জালের বেড়ায় আটকাইয়া রাখিবার দরকার হইত না। তাহারা শিকারখানার আশেপাশে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত আবার কখনও কখনও পেশবার মজলিসেও হাজির হইত। খ্যাতনামা ইংরাজ—গ্রন্থকার—জেম্‌স ফর্ব্বস তাঁহার 'Oriental Memoirs' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরাজ দূত সার চার্ল্‌স ম্যালেট কর্তৃক বিবৃত, পার্ব্বতী শৈলের নিকট রমনায় রক্ষিত পেশবার পোষা হরিণের দরবারে আসার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বোধহয় এই বিবরণটি পাঠক বর্গের চিত্তাকর্ষক হইবে—

"পুণা হইতে চারি মাইল দূরে, তাঁহার রমণায় একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিবার জন্য পেশবা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গীদের লইয়া বিকাল দুইটার সময় সেখানে গেলাম। আমরা দেখিলাম সেখানে তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তাঁবুর দরজায় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই পেশবা আসিলেন। আমরা সকলে গালিচার উপর বসিলে দেখিলাম চারিটি সুন্দর কৃষ্ণসার একদল অশ্বারোহীর আগে আগে আসিতেছে। অশ্বারোহীর দল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গঠিত,

প্রত্যেক সওয়ারের হাতে একটা লম্বা লাঠি। লাঠির আগায় একখানি লাল কাপড়। হরিণগুলি তাঁবুর নিকট আসিলে খুব জোরে বাজনা আরম্ভ হইল। তিনটা হরিণ তাঁবুতে প্রবেশ করিল। দুইধারে দুইটা দোলনা ঝুলিতেছিল, তাহার উপর উঠিয়া দুইটি মৃগ অতি সুন্দরভাবে বসিল। তৃতীয় হরিণটিও ঠিক ঐরূপ ভঙ্গিতেই গালিচার উপর বসিল। বাদ্যধ্বনি থামিলে একদল নর্ত্তকী তাঁবুতে প্রবেশ করিল। তাহারা মৃদু বাজনার তালে তালে হরিণের সামনে নাচিতে লাগিল, আর হরিণ তিনটাও নিতান্ত নিরুদ্বেগে বসিয়া রোমন্থন করিতে লাগিল। চতুর্থ হরিণটা বোধহয় ইহাদের অপেক্ষা একটু ভীতু, সেটা এতক্ষণ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল, এই সময় সেটাও তাঁবুতে ঢুকিয়া গালিচায় বসিল। একজন ভৃত্য হরিণের দোলনা আস্তে আস্তে দোলাইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও হরিণদের কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। পেশবার ইচ্ছামত এই তামাসা খানিকক্ষণ চলিল, পরিশেষে পশুরক্ষক বড় হরিণের শৃঙ্গে একগাছি ফুলের মালা পরাইয়া দিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চারিটা হরিণই একসঙ্গে চলিয়া গেল।

"পেশবা আমাকে বলিলেন যে, হরিণগুলিকে এইরূপ পোষ মানাইতে সাত মাস সময় লাগিয়াছে। এই হরিণ কয়টি রমনায় বড় বড় হরিণের পালের সহিত চরিয়া বেড়ায়, সুতরাং তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা দেখানো হয় নাই। রমনার চতুর্দ্দিক খোলা, কোন প্রকারের বেড়াই নাই। আমি শুনিলাম যে, তাহাদিগকে খাদ্যের লোভ দেখাইয়াও শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। পেশবা বলিলেন যে, হরিণগুলি বাদ্যধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহার দরবারে আইসে।" রমণার হরিণ পেশবার তাঁবুতে বাজনা শুনিতে আসিত, আবার ঐ রমণার মাঠেই মাঝে মাঝে

লোকজন লইয়া পেশবা হরিণ শিকারে যাইতেন। পেশবা জাতিতে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধের সময় নরমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিতে তাঁহার হৃদয়ে বোধ হয় ব্যথার লেশ সঞ্চারও হইত না, কিন্তু হরিণ তিনি মারিতেন না, শুধু ধরিতেন। কতক নিজের কাছে রাখিতেন, দুই একটি তাঁহার সামন্ত দিগকে উপহার দিতেন, আর বাকী সব আবার ছাড়িয়া দিতেন। এইরূপ একটি শিকারের কাহিনী বাসুদেব বামন শাস্ত্রীখরে সম্পাদিত ঐতিহাসিক লেখ-সংগ্রহের নবমখণ্ডে মুদ্রিত একখানি পত্রে পাওয়া যায়। পত্র-খানির লেখক সাঙ্গলীর সরদার চিন্তামণ রাও আপা। তিনি লিখিয়াছেন—

"গতকল্য শ্রীমন্ত রমণায় হরিণ বেড়িয়া ধরিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-দিন আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা হইয়াছিল, কল্য অরুণোদয়ে ভোজন করিয়া ফৌজ সহ আসিবে। আজ্ঞানুসারে অরুণোদয়ে ভোজন করিয়া তৈয়ার হইয়া পুলের নিকট নদী পার হইয়া গেলাম। তীর্থ স্বরূপ রাজশ্রী দাদা, রামচন্দ্র পন্থ আপা, শ্রীপতরাও ভট্ট; চিরঞ্জীব রাজশ্রী বাপু ও নারায়ণ রাও আবা প্রভৃতিকে লইয়া আমরা যাইয়া দাঁড়াইলাম। কিছু পরেই শ্রীমন্ত আসিলেন। তাঁহার সহিত বিঠ্ঠলবাড়ীর দেড় ক্রোশ ওধারে বড়গাঁও পর্য্যন্ত গেলাম। পাহাড়ের উপর ফৌজের লাইন ও নীচে পদাতিকের শ্রেণী খাড়া করা হইল, তাহার পর চীৎকার করিয়া হরিণ খেদাইতে আরম্ভ করিলাম; এক কি দুই শত হরিণ পলাইয়া গেল, শ' দুইশ' হরিণ আমাদের বেড়ের ভিতর রহিল। এইভাবে হরিণ তাড়াইতে তাড়াইতে গনেশ-খিণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়া শ্রীমন্তের অভিযান সেইখানে থামিল। রাজশ্রী মহাদজী সিন্ধিয়া সেখানে আসিলেন। আমাদের ফৌজের লাইন দিয়া একটা কৃষ্ণসার যাইতেছিল, আমাদের

লোকেরা সেটাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি পরে হরিণটা শ্রীমন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তখন আজ্ঞা হইল, ওটা তোমার লোকদের নিকটেই থাকুক। চতুর্দ্দিক হইতে হরিণ তাড়াইয়া আনা হইয়াছিল, সেগুলা ফৌজ ও পদাতিকের বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইতে লাগিল। যায়গায় যায়গায় তাহাদিগকে ধরা গেল। পঁচিশটা হরিণ ধরা পড়িয়াছিল। গোটাকয়েক বড় বড় কৃষ্ণসার লাফ দিয়া আমাদের বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইয়া গেল। এই সময় বেলা প্রায় সওয়া দুই প্রহর হইয়াছিল। সিন্ধিয়া আরবিজ করিলেন যে আমাকে একটা কৃষ্ণসার দিবার আজ্ঞা হউক। শ্রীমন্ত উত্তর করিলেন—তোমাকে দিবনা, তুমি বধ করিবে। তখন সিন্ধিয়া বলিলেন যে সাহেবের পায়ের শপথ সেরূপ হইবেনা। তাহার পর তাঁহাকে একটি কৃষ্ণসার দিলেন এবং সিন্ধিয়া বিদায় লইয়া গেলেন। সিন্ধিয়া তাঁহার সমস্ত ফৌজ আনেন নাই। সঙ্গে শ'দুইশ পাইক মাত্র ছিল। সিন্ধিয়া চলিয়া যাইবার অল্পকাল পরেই শ্রীমন্তের অভিযান ফিরিয়া চলিল। আমাদের নিকট একটা কৃষ্ণসার ছিল, আরও একটা হরিণ পাঠাইয়াছেন। তীর্থ স্বরূপ রাজশ্রী রামচন্দ্র পন্থ আপাকে একটা হরিণ পাঠাইয়াছেন। সরকারে পাঁচটি হরিণী ও পাঁচটি কৃষ্ণসার আনিয়াছেন, বাকী ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমাদের কৃষ্ণসার ও রামচন্দ্র পন্থ আপার হরিণী মরিয়া গিয়াছে। আমাদের একটি হরিণী আছে। ভালই আছে। ঘাস দানা খায়। যত্ন করিতে আজ্ঞা হইয়াছে।" দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের বাঘ শিকারের বিবরণ এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের চিঠিতে আছে।

চিন্তামন রাওর লিখিত এই হরিণ ধরার বিবরণ মুঘল সম্রাটদিগের কামারঘা শিকারের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। মুঘল বাদশাহেরা বিরাট বাহিনী লইয়া বড় বড় জঙ্গল বেড়িয়া ফেলিতেন। তাহার পর সেই

মানুষের জাল ক্রমে ক্রমে গুটাইয়া লইয়া, সর্ব্বপ্রকারের পশু খেদাইয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানে লইয়া আসিতেন। বাঘ, ভালুক, সিংহ, হরিণ সকল রকমের ছোট বড় হিংস্র এবং নিরীহ পশু এই মানুষের জালে আটক হইত। সম্রাট নিজ হস্তে তাহাদের প্রাণ সংহার করিতেন। সে একটা বিরাট ব্যাপার। সম্রাটের মৃগয়া ক্ষেত্র বিশাল অরণ্য, সঙ্গে অগণিত সেনা; অগণিত পশু সম্রাটের গুলিতে, সায়কের অব্যর্থ সন্ধানে হত হইত। তাহার তুলনায় পেশবার এই শিকার অভিযান নিতান্তই নগন্য ব্যাপার। তাঁহার মৃগয়ার স্থান রমণার ময়দান, মৃগয়ার প্রাণী হরিণ, তাহাও আবার তিনি মারিতেননা, ধরিয়া আনিতেন বা ছাড়িয়া দিতেন। সঙ্গে থাকিত সামান্য লোকজন। সিন্ধিয়ার মত সর্দ্দার তাঁহার সমস্ত ফৌজ লইয়া আসা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পেশবার এই শিকার যাত্রা মুঘল সম্রাটের কামারঘা শিকারের অনুকরণ মাত্র। উভয় শিকারের প্রণালীই এক। উভয় শিকারেই মানুষের জালে অরণ্য-পশু ঘিরিয়া ক্রমশঃ সেই জাল গুটাইয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে জড় করিয়া ধরা অথবা মারা হইত। কেবল এই শিকার ব্যাপারে নহে, শেষকালে পেশবাগণ বহুব্যাপারে—অশনে, ব্যসনে, ভূষণে, মুঘলদিগের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

উপসংহার

মারাঠা সৈন্যদিগের কথা বলিয়াছি, ছত্রপতি ও পেশবার কথাও কিছু কিছু বলিয়াছি, মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের কথাও বলা হইয়াছে, কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্য লইয়া হিন্দু সাধারণের গর্ব্ব করিবার কোন সঙ্গত হেতু আছে কিনা সে কথা আলোচনা করা হয় নাই। মারাঠারা হিন্দু, এ কথা সত্য, তাঁহারা দিগন্ত-বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এ কথাও সত্য, কিন্তু সেই সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া তাহা লইয়া গৌরব করা চলে না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্য হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রসার ও উন্নতিকল্পে কি করিয়াছে, মারাঠা সাম্রাজ্যের অনুসৃত নীতির সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মনীতির কোন ঐক্য ছিল কিনা তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

সাধারণের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্য মাত্রই গৌরবের বিষয় হইতে পারে, কারণ জাতীয় চরিত্রে কতকগুলি অসাধারণ গুণের সমাবেশ না হইলে সাম্রাজ্য সৃষ্টি বা সাম্রাজ্য রক্ষা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে আমরা মারাঠাদিগকে লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী দস্যু বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা পাইয়াছি, কেবল হত্যা, প্রতারণা ও দস্যুতার দ্বারা সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হয় কিনা সে বিচার করিবার অবকাশ আমাদের হয় নাই। দিগ্বিজয়ী সম্রাট নাদির শাহ প্রথমে দস্যু-দলপতি ছিলেন, সেদিন আর এক দস্যু নায়ক অল্প দিনের জন্য কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিভাশালী দস্যু-দলপতির পক্ষে রাজা হওয়া অসম্ভব নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে কেবল ছলনা ও

পশুবল যে শক্তির ভিত্তি, তাহার আয়ু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। নাদিরের মৃত্যু হইয়াছিল আততায়ীর ছুরিকাঘাতে। তিনি ইরাণের বাদশাহী পাইয়াছিলেন, দিল্লীর বাদশাহী ধুলিসাৎ করিয়াছিলেন, কাস্পিয়ানের তটভূমি হইতে যমুনার তীর পর্য্যন্ত তিনি নর শোণিতের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে ভয় করিত, ভীতির কারণ দূর হইবা মাত্র বাধ্যতার শৃঙ্খলও ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আর ভিস্তি-পুত্র হবিবুল্লার (বাচ্চা-ই-সাকোর) রাজত্বের সহিত ত আবুহোসেনের দিনেকের বাদশাহীর তুলনা করিলেও অন্যায় হয় না। শিবাজীকেও সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকেরা দস্যু বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, বাঙ্গালার পল্লী-শিশুরা পরবর্ত্তী কালের বর্গী আক্রমণকারীদিগকে দস্যু বলিয়াই জানে, কিন্তু নাদির ও শিবাজী বোধহয় সমশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। বাচ্চা-ই-সাকোর সহিত শিবাজীর তুলনা বাতুলেও করে না। ইহারা সকলেই বিদ্রোহী। সকলেই রাজশক্তির উচ্ছেদ করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলেন, সকলেই প্রচলিত শাসনতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু নাদির তাঁহার নবলব্ধ ক্ষমতার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই, প্রাচীনের জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের উপর তিনি নবীন সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই। পশুবলের প্রভাবে, নির্য্যাতনের সাহায্যে তিনি সকল প্রতিবাদ স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত জীবন শক্তি ও সম্পদের আরাধনা করিয়াছেন, আত্মসুখের জন্য, স্বার্থের অনুরোধে ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। প্রজার মঙ্গল তাঁহার লক্ষ্য ছিলনা, আত্মসেবাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তাই যে দানবী শক্তি ও লালসার তিনি উদ্বোধন

করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার জীবনের অবসান করিয়াছিল—আততায়ীর ছুরিকায়, প্রণয়িনীর শয্যায়। শিবাজীও শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহার উপাস্য-দেবী ভবানীর এক হস্তে যেমন খড়্গ অন্য হস্তে তেমনই বরাভয়। সুতরাং তাঁহার শক্তি-পূজায় সংযমের অভাব ছিলনা। তিনি ভোগের জন্য সম্পদ চাহেন নাই। নূতন সৃষ্টির জন্য পুরাতনের অপসারণ অপরিহার্য্য। তাই তিনি সাময়িক অকল্যাণের পথে শাশ্বত কল্যাণের আবাহন করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার রাজ্যের অবসান হয় নাই, তাঁহার বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেও সে রাজ্যের অধঃপতন ঘটে নাই। শ্মশানে তিনি যে শিব আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নূতন পুরোহিত তাহার পূজার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। সেই পূজারী যেদিন শিবাজীর কল্যাণ-মন্ত্র ভুলিয়া গেলেন, সেই দিন মন্দির হইতে সহসা দেবতার অন্তর্ধান হইল, মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন হইল, শিবাজীর গৈরিক পতাকা পথের ধুলায় অবলুন্ঠিত হইল।

মারাঠাদিগের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় হইয়াছিল তাহাদের অধঃপতনের যুগে, সংঘর্ষের মধ্যে। যাহারা বাঙ্গালার শান্ত পল্লীতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে, বাঙ্গালার নারীদিগকে যাহারা লালসার উপকরণ-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে, বাঙ্গালার শস্য ক্ষেত্র অশ্ব পদতলে দলিত করিয়াছে, সোণার বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত করিয়াছে তাহাদিগকে যে বাঙ্গালী শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই, ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু রঘুজী ভোঁসলা ও ভাস্কর পণ্ডিতকে শিবাজীর প্রতিনিধি বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। যাহাদের নির্ম্মম নীতির ফলে বালিকা কৃষ্ণকুমারীকে বিষ পান করিতে হইয়াছিল, তাহারাও শিবাজীর আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছিল তাই নবজাগ্রত বাঙ্গালী যখন জাতীয় শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঔদার্য্যের প্রতীক

অনুসন্ধানে বাহির হইল, তখন মহারাষ্ট্র তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই—তাহার মুগ্ধ চক্ষু স্বভাবতই রাজপুতানার মরুভূমিতে, আরাবলীর অরণ্যানীতে নিবদ্ধ হইয়াছিল। মারাঠারা চতুর, মারাঠারা দুঃসাহসী, মারাঠাদিগের রণকৌশলে মুঘল সাম্রাজ্য ছারখার হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুজাতি ত কেবল সাফল্যের মানদণ্ডে মনুষ্যত্বের পরিমাপ করে নাই। কুরুক্ষেত্রে ভগ্ন উরু দুর্য্যোধনকে ত তাহারা বীর হিসাবে বিজয়ী ভীমসেনের নিম্নে স্থান দেয় নাই। তাহাদের বিচারে ছিন্ন পক্ষ জটায়ু দিগ্বিজয়ী দশানন অপেক্ষা অধিক সম্মানের পাত্র। যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা আচরণ, রামচন্দ্রের অন্যায় যুদ্ধ তাহারা অদ্যাপি ক্ষমা করিতে পারে নাই। সুতরাং সাংসারিক দৃষ্টিতে মারাঠাদিগের কুটনীতি যতই সার্থক হউক না কেন আদর্শবাদী বাঙ্গালী তাহা হইতে কোন প্রেরণা লাভ করে নাই। যে রাজপুত মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও রণক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই, সর্ব্বনাশের দ্বারস্থ হইয়াও আশ্রিতকে পরিত্যাগ করে নাই, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে, জাতীয়তার প্রথম যুগে বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক, বাঙ্গালী স্বদেশ-প্রেমিক সেই রাজপুতের আদর্শে প্রাচীন হিন্দু আদর্শের মাহাত্ম্যই প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। রাজপুতানার ত্যাগের তুলনায় মারাঠা সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সেদিন আমাদের নিকট নিতান্তই অকিঞ্চিত-কর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেদিন আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে শিবাজীর সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতেও ছিল হিন্দুর সনাতন আদর্শবাদ, নতুবা মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা শিবাজীকে শিবের অবতার বলিয়া পূজা করিত না।

শিবাজী যদি কেবল আত্মসুখ চাহিতেন, তিনি যদি ধন, মান ও

প্রতিপত্তির ভিখারী হইতেন, তাঁহার পক্ষে সহজ ও নিরাপদ উপায়ের অভাব ছিলনা। নিরাপদ পথেই তাঁহার যশোলিপ্সাও পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। তাঁহার পিতা ছিলেন বিজাপুরের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী। দিল্লীর দরবারেও শাহজীর বীরখ্যাতি অজ্ঞাত ছিলনা। সুতরাং শিবাজী অনায়াসে রাজসেবা করিয়া ধন, মান, যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন। বিজাপুরের ক্ষুদ্র রাজ্য কর্ম্মক্ষেত্র হিসাবে সঙ্কীর্ণ ও অপরিসর মনে করিলে তিনি অনায়াসে দিল্লীর বাদশাহের সেনা দলে যোগদান করিতে পারিতেন,। কিন্তু এই নিরাপদ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় বিদ্রোহের বিপদ সঙ্কুল আবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যে এই পথের সঙ্কটের কথা না জানিতেন এমন নহে। পরাজয়ের ফল কি হইবে তাহা না জানিয়া শিবাজীর মত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দূরদর্শী নায়ক কখনই বিজাপুরের সুলতান ও দিল্লীর বাদশাহের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হন নাই! তিনি জানিতেন যে পরাজয়ের শাস্তি কেবল প্রাণদণ্ডেই শেষ হইবে না, তখনকার দিনে বিজিত বিদ্রোহীর শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী নারীদিগকেও যে অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইত, মৃত্যু তাহার নিকট নিতান্তই তুচ্ছ। শিবাজী পরাজিত হন নাই, বিজয় লক্ষ্মীর অনুগ্রহে তিনি রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের ভবিষ্যত-পন্থা নির্ব্বাচনের সময় এই তরুণ যুবক কতখানি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহা আমরা অনেক সময়ই হিসাব করিনা। মনে রাখিতে হইবে যে শিবাজী যখন স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেন, তখন দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে শাহজাহান অধিষ্ঠিত। শাহজাহান বা ঔরঙ্গজীবের সময় মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের এক সামান্য জায়গীরদার-পুত্রের অস্ত্র ধারণ তখনকার দিনে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বাতুলতা বলিয়াই বিবেচনা করিয়া

থাকিবেন। অবশ্য শিবাজী প্রথমেই দিল্লীর বাদশাহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই, তিনি পূর্ব্বে বিজাপুরের সুলতানের সহিত সংগ্রামে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিলেন। তোরণা দুর্গ দখলের পর প্রায় তিন শত বৎসর হইতে চলিল। সুতরাং বিজাপুরের রাজশক্তি যে তখন ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছিল তাহা আমাদের পক্ষে জানা সহজ। কিন্তু সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের পক্ষে দক্ষিণাপথের সুলতানদিগের আভ্যন্তরীন দুর্ব্বলতার কথা অনুমান করা মোটেই সহজ ছিল না। তাঁহারা জানিতেন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সেনানায়কেরা তখনও কর্ণাটকে রাজ্য বিস্তার করিতে ব্যস্ত। দিল্লীর বাদশাহের তুলনায় বিজাপুরের সুলতান ক্ষীণশক্তি হইলেও পুণার সামান্য জায়গীরদার-পুত্রের পক্ষে তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করা নিতান্ত স্পর্দ্ধার কথা বই কি? সেইজন্য যাঁহাদের কিছু লোকসানের ভয় ছিল, যাঁহাদের উচ্চ পদ ছিল, জায়গীর ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, সেই সম্পন্ন সম্প্রদায়ের খুব অল্পলোকই শিবাজীর আনুকূল্য করিয়াছিলেন। কর্ণাটকের নিম্বলকার পরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, মুধোলের ঘোরপড়ে ও বাডীর সাবন্তেরা তাহার জ্ঞাতি, কিন্তু ইহাদের নিকট তিনি পাইয়াছিলেন কেবল প্রতিকূলতা। প্রচলিত প্রবাদ বিশ্বাস করিলে তাঁহার অভিভাবক বৃদ্ধ দাদাজী কোণ্ডদেও তাঁহার অসম সাহসিক কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন বিপদের সম্ভাবনা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূলতা, অভিভাবকের নিষেধ শিবাজীকে তাঁহার নির্ব্বাচিত পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। একটা বড় রকমের আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে তিনি জানিয়া শুনিয়া এত সব বিপদের পথে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না।

কিশোর বয়সে অসমসাহসিক কার্য্যের একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ

থাকে। ইংরাজীতে যাহাকে বলে adventure কেবল তাহারই উন্মাদনায় সেকালে ও একালে অনেক তরুণ বীর অজ্ঞাত বিভীষিকার সম্মুখীন হইয়াছেন। কিন্তু কেবল দুঃসাহসের কাজ করিবার লোভে শিবাজীর বিদ্রোহী হইবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার পিতা আহম্মদ নগরের সুলতানের রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত দিল্লীর বাদশাহের সহিত অসমান যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি অসাধারণ সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, অনেক সময় অদ্ভুতভাবে প্রবল শত্রুসেনার অপ্রত্যাশিত আক্রমণ হইতে তিনি আপনার ও অনুচরদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। শিবাজীও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিজাপুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দিল্লীর বিরাট বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন। তাহার পরিণাম যাহাই হউক না কেন তাহাতে adventureএর অভাব হইত না। স্বাধীনতা-সংগ্রাম উপলক্ষ্যে তিনি মুষ্টিমেয় সহচর লইয়া রজনীর অন্ধকারে সায়েস্তা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দিয়া ঔরঙ্গজীবের রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, ছদ্মবেশে উত্তর-ভারতের তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, মধ্যভারতের বনপথ দিয়া দক্ষিণাপথে পৌঁছিয়াছিলেন, বিজাপুরের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও ত এইরূপ রোমাঞ্চকর অভিযানের সুযোগ ঘটিতে পারিত। সুতরাং কেবল দুঃসাধ্য-সাধনের আকাঙ্খায় তিনি অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন ইহাই বা কেমন করিয়া বলিব? এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নিছক এ্যাডভেঞ্চারের উন্মাদনায় মানুষ প্রিয়জনকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দেয় না। নিশ্চিত উন্নতির পথ ছাড়িয়া আপনার প্রাণ ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জনদিগকে মানুষ তখনই বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, যখন সাংসারিক উন্নতি, ধন, মান ও প্রতিপত্তি অপেক্ষা অনেক বড়, মহত্তর

কোন কর্ত্তব্যের আহ্বান আসে। শিবাজীও সেইরূপ কোন কর্ত্তব্যের আহ্বানে নিশ্চিত সুখের পথ ছাড়িয়া অনিশ্চিতের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শিবাজী দক্ষিণাপথে "ধর্ম্মরাজ্য" "হিন্দুস্বরাজ্য" "মহারাষ্ট্র বাদশাহী" স্থাপন করিয়াছিলেন। "হিন্দুস্বরাজ্যের" স্বরূপ তিনি কোথাও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু ইহা আমাদের অনুমান নহে। তাঁহার তরুণ বয়সেই তাঁহার বিশ্বস্ত সহযোগী দাদাজী প্রভুকে তিনি জানাইয়াছিলেন যে "হিন্দুস্বরাজ্য স্থাপন দেবতার অভিপ্রায়।" আপনার অন্তরে এই দৈব নির্দ্দেশ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে বিপদের পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, স্বার্থের অনুরোধ, প্রিয়জনের নিষেধ তাঁহাকে কাম্যপথ হইতে ফিরাইতে পারে নাই। প্রথম অবধিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল হিন্দুস্বরাজ্য স্থাপন, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। আজকাল অনেকেই পাঠান সম্রাট শেরশাহের সহিত শিবাজীর তুলনা করিয়া থাকেন। শেরশাহ ও শিবাজী উভয়েই জায়গীরদারপুত্র, উভয়েই বাল্যকালে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, উভয়েই উত্তরকালে স্বীয় প্রতিভাবলে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, উভয়েই একাধারে যোদ্ধা ও প্রজাপালক, কূটরাজনীতিজ্ঞ ও শাসন সংস্কারক। কিন্তু শিবাজীর মত শেরশাহ কোন এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শেরশাহ ছিলেন সুবিধাবাদী। আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি প্রয়োজন হইলে মোগল-দিগের সহিত যোগদান করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার দোষেই একবার মোগলদিগের হস্তে পাঠান পক্ষের পরাজয় হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার প্রতিপক্ষেরা অনুযোগ করিয়া থাকেন। এই অভিযোগ একেবারে অমূলক নহে। পাঠান স্বাধীনতা তাঁহার একমাত্র কাম্য হইলে

তিনি পাঠান জাতির দুঃসময়ে নির্লিপ্ত উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল নিজের উন্নতি, আত্মপ্রাধান্য; নিজের উন্নতি সাধন করিয়া তিনি পাঠানদিগের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পাঠানেরা শেরশাহের রাজ্য রক্ষা করিতে পারে নাই, পরন্তু সেই রাজ্য বিনাশের হেতু হইয়াছিল। অপর পক্ষে যতদিন মারাঠাজাতি শিবাজীর আদর্শ বিস্মৃত হয় নাই ততদিন প্রবল অন্তঃকলহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণেও মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি অটল রহিয়াছে, যখন তাহারা শিবাজীর আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছে তখন তাহাদের সাম্রাজ্যও নষ্ট হইয়াছে।

শিবাজীর মাতৃভক্তির তুলনা নাই। বাল্যকাল হইতে মায়ের কোলেই তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। এই দুরন্ত বালক কোনদিন অক্ষর পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছে কি না আমরা জানি না। কিন্তু মায়ের মুখে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া তাঁহার যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা জন্মিয়াছিল তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে কখনও তাহা শিথিল হয় নাই। মাতার অনুমতি না লইয়া তিনি কোন কঠিন কাজে হাত দেন নাই। "রাবণের মত" শক্তি-শালী আফজল খাঁর সহিত তিনি যখন দুইজন মাত্র সহচর সমভিব্যহারে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তখন কি কেবল বর্ম্ম ও শিরস্ত্রান, বাঘনখ ও বিচুয়া তাহার অন্তরে সাহসের সঞ্চার করিয়াছিল? যাত্রাকালে তিনি যে জননীর পদধূলি লইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া বাহির হইয়াছিলেন তাহাই কি তাঁহার বাহুতে অধিকতর শক্তির সঞ্চার করে নাই? যখন তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে শিশু পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কুটচক্রী ঔরঙ্গজীবের রাজধানীতে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন কি তাঁহার সাবধানী অন্তরের কোণে একবারও বিপদের সম্ভাবনার ছায়া পড়ে নাই? পড়িয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে তিনি কোন মন্ত্রী বা সেনাপতির হস্তে রাজ্য-রক্ষার দায়িত্ব সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। "দেব-ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-রাজ্যে"র রক্ষণাবেক্ষনের ভার তিনি দিয়া গেলেন দেবী-স্বরূপিনী জননীর হাতে। আবার যখন পিতার মৃত্যুর সংবাদ আসিল, মাতা জিজাবাঈ যখন হিন্দু ললনার শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেন, তখন যে শিবাজীর ভয়ে সমস্ত দক্ষিণাপথ কম্পিত, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর ভয়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হন নাই, সেই শিবাজী শিশুর মত মাতার গলা ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন। চক্ষুর জলে জননীর কঠিন সঙ্কল্প ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এমন মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষেও দুর্ল্ভ। বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নও মাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু তাঁহার মাতৃভক্তি তাঁহাকে কামজয়ী করিতে পারে নাই। শিবাজীর মাতৃভক্তি তাঁহাকে সমস্ত নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। মাতার নিকটই তিনি হিন্দু রাজ্য স্থাপনের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। মাতার মুখেই তিনি শুনিয়াছিলেন নারীর দীর্ঘশ্বাসে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ভস্ম হইয়াছিল। তাই তাঁহার রাজ্যে নারী-নিগ্রহের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। তাই বন্দিনী যুবতীকে তিনি কখনও অসম্মান করেন নাই। আবাজী যখন কল্যাণের মুসলমান শাসন-কর্ত্তার সুন্দরী পুত্রবধুকে শিবাজীর নিকট উপহার স্বরূপ উপস্থিত করেন তখন তিনি তাঁহার রূপের যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহাকে মাতৃপূজার পূতমন্ত্র বলিলেও অন্যায় হইবে না। ভীতি-বিহ্বলা, বেপথুমতী যুবতী শুনিল বিদ্রোহী কাফের বলিতেছে, 'মা তোমার এত রূপ, যদি তোমার গর্ভে আমার জন্ম হইত তাহা হইলে আমিও ত তোমারই মত সুন্দর হইতাম!' অথচ সে যুগে পুরুষের পক্ষে, বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ যোদ্ধার পক্ষে পরদার-পরায়ণতা ততটা নিন্দনীয় ছিল না।

সাধারণতঃ যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈনিকেরা একটু বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়াই থাকে, কিন্তু পররাজ্য আক্রমণের সময়েও শিবাজী কখনও নারীর লাঞ্ছনা বা ধর্ম্মস্থানের অমর্য্যাদার প্রশ্রয় দেন নাই। একবার উৎসব উপলক্ষে সমাগত এক ব্রাহ্মণবধূ সাম্ভাজী কর্ত্তৃক অপমাণিত হইয়াছিলেন। সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীও সেবার শিবাজীর ক্রোধ হইতে রক্ষা পান নাই। তিনি পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। "মাতৃদেব রাজার" রাজ্যে মাতৃজাতির অসম্মানের ক্ষমা ছিল না।

শিবাজীর ধর্ম্মরাজ্যের ইহাই একমাত্র বিশেষত্ব নহে। রামদাস স্বামীর জ্বালাময়ী কবিতা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে শিবাজী যখন মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তখন হিন্দুদিগকে নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। এই উৎপীড়নের প্রতিকার ও হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষার জন্যই শিবাজী "হিন্দু স্বরাজ্য" স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া ছিলেন। রামদাস যে "আনন্দ বনভুবনের" বা স্বাধীন মহারাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাতে স্নান ও সন্ধ্যার জন্য জলের অভাব ছিলনা অর্থাৎ নিরুপদ্রবে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাধা ছিলনা। "হিন্দু স্বরাজ্যে" যে স্বচ্ছন্দে হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার পালনের কোন প্রতিবন্ধক থাকে নাই ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। শিবাজী স্বয়ং নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, ধর্ম্মের জন্য তিনি রাজ্য, সিংহাসন এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কর্ণাটকের পথে, শ্রীশৈল মন্দিরে তিনি নিজের শির উৎসর্গ করিয়া দেবীর পূজা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংঘর্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক অনুদারতা ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইতে পারে। শিবাজী স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সুতরাং তিনি যদি

অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন তাহাও অস্বাভাবিক হইত না। কিন্তু মুসলমান রাজ্য আক্রমণ কালেও তিনি কখন মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ, ধর্ম্মস্থান বা সাধুব্যক্তিদিগের অবমাননা করেন নাই। মুসলমান কেন, অন্য কোন ধর্ম্মের সাধুপুরুষদিগকেই তিনি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে বিরত হন নাই। সুরাটের ক্যাপুচান খ্রীষ্টান পাদরীরা দীন-দুঃখীর সেবা করিতেন, এইজন্য সুরাট লুণ্ঠণ কালে শিবাজী তাঁহাদিগের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। একজন হিন্দু দালাল দানশীলতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শিবাজীর নির্দ্দেশে তাঁহার গৃহ লুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তিনি যে কেবল পরধর্ম্ম সহিষ্ণু ছিলেন তাহা নহে, তিনি সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শী ছিলেন। তিনি যেমন মন্দির নির্ম্মানের জন্য, দেব সেবার জন্য অর্থ ও নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন তেমনই মুসলমানের ধর্ম্মস্থাপনের জন্যও সেইরূপ অর্থ ও নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু সাধু ও মুসলমান পীরদিগকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই জন্যই তুকারাম, রামদাস ও সেখ মহম্মদের স্নেহ সমানভাবে অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অথচ দিল্লী ও বিজাপুরের পক্ষ হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাবে আঘাতের পর আঘাত করা হইয়াছে। আফজল খাঁ তুলজাপুরের ভবানী দেবীর মন্দির অপবিত্র করিয়া দেবীমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জঞ্জিরার হাবসীগণ সুবিধা পাইলেই দেবতা ও ব্রাহ্মণের অপমান করিত। কিন্তু গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছত্রপতি শিবাজী ইহার প্রতিশোধে কোন মুসলমান ধর্ম্মস্থানের অমর্য্যাদা বা মুসলমান সাধুর অপমান করেন নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হইলে তাহা সসম্মানে মুসলমানদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিতেন। শিবাজীর ধর্ম্ম রাজ্যে কাহারও ধর্ম্মভাবে আঘাত করা হইত না।

এই উদারতা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। মুসলমান ও খ্রীষ্টানেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী পরস্পরকে নিঃশেষ ও নির্ম্মূল করিবার জন্য যেমন নির্ম্মমভাবে যুদ্ধ করিয়াছে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে সেরূপ কঠোর যুদ্ধ হয় নাই। মুসলমান মনে করে তাহার ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, তাহার ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোথাও মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবেনা। কোন্ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মিথ্যার সহিত সন্ধি করিবে, অসত্যের উচ্ছেদ করিতে পরান্মুখ হইবে? খ্রীষ্টানেরাও অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে এক মাত্র তাহার ধর্ম্মই সত্য, খৃষ্টই এক মাত্র মানুষের ত্রাণকর্ত্তা। এই জন্য মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিরোধ চলিয়াছে, সে বিবাদের আপোষ হইতে পারে নাই। সে বিরোধের সমাপ্তি হইয়াছে স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতে মুসলমানদিগের উচ্ছেদ ও জরুজালেম হইতে খৃষ্টানদিগের বিতাড়ণে। পশ্চিম য়ুরোপের মসজিদে গুম্বজের উপর ক্রশ স্থাপিত হইয়াছে আর ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব প্রান্তে খ্রীষ্টান দিগের গীর্জ্জা মসজিদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু বিশ্বাস করে সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক, ভিত্তি এক। সকল ধর্ম্মের লোকেরাই এক ভগবানের উপাসনা করে, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই মুক্তির বীজ নিহিত আছে। এই জন্য জেহাদ্ বা ক্রুসেড হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নহে। প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন করিতে পারেনা। কারণ বিধর্ম্মীকে স্ব-সম্প্রদায় ভুক্ত করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নহে। শিবাজী প্রকৃত হিন্দু ছিলেন, তিনি অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের নির্য্যাতনের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই, গোব্রাহ্মণ প্রতিপালনের জন্য, হিন্দুর তীর্থস্থান ও মন্দির রক্ষার জন্য নারীজাতির সম্মান রক্ষার জন্য, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে রাজ্যের রাজা হিন্দু, মন্ত্রী হিন্দু, কিন্তু সকল ধর্ম্মের

সকল সংপ্রদায়ের লোক সেখানে নিরুপদ্রবে নির্ভয়ে আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করিতে পারিত।

শিবাজীর রাজ্য ছিল স্বেচ্ছাতন্ত্র অর্থাৎ autocracy আর সেকালের অন্যান্য রাজার মত তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতন্ত্রী রাজা বা autocrat তাঁহার আদেশের বিচার চলিত না, তিনি অন্যায় হুকুম করিলেও তাহার প্রতিকারের উপায় ছিলনা, রাজ্যের মধ্যে তাঁহার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত, তাঁহার ইচ্ছাই ছিল আইনের বিধান। কিন্তু তিনি কখনও কোন অনাচারের প্রশ্রয় দেন নাই। তখনকার দিনে রাজসৈনিকরা অল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে কাহারও নিকট কোন জিনিস লইলে তাহা যতই অন্যায় হউক কেহ অসাধারণ ঘটনা বলিয়া মনে করিত না —, এদেশেও না, অন্যান্য সুসভ্য দেশেও না। কিন্তু শিবাজী তাঁহার সৈন্যদিগের এতটুকু উচ্ছৃঙ্খলতাও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেননা। একবার বর্ষাকালে রত্নাগিরি জিলার অন্তর্গত চিপলুন নামক স্থানে একদল সৈন্যের ছাউনী পড়িয়াছিল। তাহাদের কোন অনাচারেরর কথা হয়ত শিবাজী শুনিয়াছিলেন। শুনিয়াই তিনি তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছিলেন বসদ প্রভৃতি যাহা তোমাদের প্রয়োজন হইবে ন্যায্য দাম দিয়া কিনিয়া লইবে। নতুবা লোকেরা মনে করিবে তোমরা মোগল অপেক্ষাও অত্যাচারী, প্রজার কল্যাণের জন্যই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে তিনি সাধ্য পক্ষে প্রজার প্রতি অন্যায় অত্যাচার হইতে দেন নাই।

তবে কি শিবাজী একেবারে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী ছিল? তাঁহার চরিত্র কি কোন কালিমা স্পর্শ করে নাই? জাউলীর রাজা কি তাঁহার ষড়যন্ত্রে নিহত হন নাই? কর্ণাটক বিজয় উপলক্ষে কি তিনি গোলকোণ্ডার সুলতানের সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করেন নাই? জয়সিংহের সহিত

সন্ধি করিয়া কি তিনি হিন্দু স্বরাজ্যের আদর্শ সাময়িক ভাবেও ক্ষুন্ন করেন নাই? তাঁহার আক্রমণে কি বিজাপুরের, কর্ণাটকের ও মোগল রাজ্যের বহু নিরপরাধ নরনারী গৃহহীন অন্নহীন হয় নাই?

পৃথিবীতে কোন দেশে কোন কালে বিনা যুদ্ধে রাজ্য স্থাপন হয় নাই। যুদ্ধ হইলেই অপরাধী নিরপরাধী নির্বিশেষে বহু লোক নানাভাবে বিপন্ন হইবে। সৃষ্টির সহিত ধ্বংসের, জন্মের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। শ্বাপদ সঙ্কুল বনে লোকালয় স্থাপন করিতে হইলেও নিরপরাধ জীবের ক্লেশ ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যুদ্ধ ও নরহত্যার জন্য শিবাজীকে দায়ী করা চলেনা। একথা সত্য যে তিনি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে শিবাজী একদিকে যেমন আদর্শবাদী ছিলেন, অন্য দিকে তেমনী কূটবুদ্ধি বিষয়ী ছিলেন। সাধারণতঃ আদর্শবাদীরা ভাবপ্রবণ স্বপ্নবিলাসী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে তাদৃশ কর্ম্মপটুতা দৃষ্ট হয় না, কি সম্ভব কি অসম্ভব তাহা তাঁহারা অনেক সময় বিচার করিতে পারেন না। শিবাজীর চরিত্রে আদর্শবাদ ও কর্ম্মপটুতার অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছিল। আদর্শবাদী হইলেও যাহা নিতান্তই অসম্ভব তাহা তিনি কার্যতঃ পরিহার করিয়া চলিয়া ছিলেন। হিন্দু স্বরাজ্যের স্বপ্ন দেখিলেও তিনি মহারাষ্ট্রের বাহিরে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। বিষয়ী লোকের মত লক্ষ্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল বেশী, পন্থার ভাল মন্দ তিনি তেমন বিচার করিতেন না। স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের জন্য জাউলী বিজয় প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রকাশ্য যুদ্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলেও বহু লোকক্ষয় হইত, অতএব তিনি প্রতারণার দ্বারা আপনার অভীষ্ট সাধন করিয়াছেন। জয়সিংহের সহিত সন্ধি না করিলে তাঁহার হিন্দুস্বরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হইত।

অতএব তিনি আসন্ন বিনাশ এড়াইবার জন্য তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। স্বয়ং বাদশাহের মনসবদারের পদ গ্রহণ করেন নাই, শিশুপুত্র সাম্ভাজীকে দিল্লীর মনসবদার করিয়াছিলেন, বাদশাহের দরবারেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে আবার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইলে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিয়াছেন। স্বাধীনতার আদর্শ পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব সাধারণ নীতি অনুসারে শিবাজীর কোন কোন কাজ অন্যায় মনে হইলেও বৃহত্তর লক্ষ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে অপরাধী বলা যায় না। তাঁহার মত ন্যায়নিষ্ঠ, স্বধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি যে কোন দেশের, যে কোন জাতির গৌরবের পাত্র। নহিলে মারাঠারা তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিতেন না।

শেষ